কালপেঁচার বৈঠকে

৮৪

॥ বিনয় ঘোষ ॥

কালপেঁচার বৈঠকে

5007

1502

কালপেঁচার বৈঠকে

বিনয় ঘোষ

5007

1502

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
৩ নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭

লঘুগুরু ভঙ্গিতে সম্প্রতি লেখা, বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হল। পত্রিকায়, সাহিত্য-সভায় ও বেতারে লেখাগুলি প্রকাশিত, আলোচিত ও পঠিত হয়েছে, গত তিনচার বছরের মধ্যে। সংকলনকালে সেগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জনও করেছি।

বিনয় ঘোষ

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বাদশাহী আমল

জনসভার সাহিত্য

কলকাতা কালচার

কালপেঁচার দু'কলম

কালপেঁচার নক্শা

যন্ত্রস্থ

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

(তিনখণ্ড)

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

5007

১

ধর্মের ষাঁড়

মেয়ে থেকে মশা পর্যন্ত অনেক বিষয় নিয়ে ভাববার আছে, ভেবেছেনও অনেকে। কিন্তু ষাঁড় সম্বন্ধে কেউ কিছু আজ পর্যন্ত ভেবেছেন কি না, আমার জানা নেই। হঠাৎ চলতে চলতে পথের সামনে ষাঁড় দেখে অনেকে হয়ত থমকে দাঁড়িয়ে তার 'মুড' বা মেজাজ সম্বন্ধে ভেবেছেন, বা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। আমি নিজেও যে ভাবিনি তা নয়। জীবনে অনেকদিন পথ চলতে অলিগলির মোড়ে বা রাস্তার বাঁকে আত্মসমাহিত বৃষভের ধ্যাননিমীলিত চক্ষুর দিকে চেয়ে তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করেছি। করিনি যে তা নয়। ভেবেছি, কি এমন সর্বগ্রাসী বিষয় থাকতে পারে যে বাইরের তুনিয়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, ধর্মের ষাঁড়ের পক্ষে দশনামী শৈবসন্ন্যাসীর মতন এরকম নির্মমভাবে উদাসীন থাকা সম্ভবপর। অথচ, বললে বিশ্বাস করবেন না, দিগম্বর জৈন শ্রমণের মতন ধর্মের ষাঁড়ের এই যে ধ্যানগম্ভীর উদাসীনভাব, এর আগাগোড়াই মনে হয় অবিমিশ্র ভণ্ডামি। অন্তত ভয়ঙ্কর শিঙ তুটির দিকে চেয়ে আমার এই কথা অনেকবার মনে হয়েছে। ধর্মের ষাঁড়ের নাসিকারন্ধ্রের বিস্ফারণ যাঁরা দেখেছেন এবং

তার সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষু ও ঘাড়বেঁকানো ভঙ্গি, তাঁরা অন্তত তার শ্রমণসুলভ নিস্পৃহতায় সন্দিহান হবেন। ধর্মের ষাঁড় দেখলে আমার তাই হুতোমপ্যাঁচার সেই বকধার্মিকের কথা মনে পড়ে। শরীরটি মুচির কুকুরের মতন নাদুসনুদুস, ভুঁড়িটি বিলেতী কুমড়োর মতন, মাথায় কামানো চৈতন্যফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা (কতকটা ষাঁড়ের শিঙের মতন বলতে পারেন), গলায় কণ্ঠির মালা, হাতে ইষ্টিকবচ। গত বছর আশী পেরিয়েছেন, বাইরে অঙ্গ ত্রিভঙ্গ, কিন্তু ভেতরে কচি প্রাণটি হামাগুড়ি দিচ্ছে। হুতোমী ভাষায় বাবাজী "গেরস্তগোছের ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্ছেন—আর হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্ছেন"। ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে আমারও তাই মনে হয়। ছেলে-বেলায় একবার তারকেশ্বর গিয়েছিলাম। বিখ্যাত একটি ধর্মের ষাঁড় ছিল সেখানে। মন্দিরের সামনে শুয়ে থাকত, দাঁড়িয়ে থাকত, ঘুরে-ফিরে বেড়াত। যেখানেই থাকুক পুজোর ঘণ্টা বাজলে ঠিক এসে দাঁড়াত মন্দিরের সামনে। সকলে বলত 'বাবার ষাঁড়', কপালে ও শিঙে সিঁদুর দিত, বিল্বপত্র দিত মাথায়, গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিত, প্রণাম করত ক্ষুরে। আমারও ষাঁড়ের গলকম্বলে হাত বুলোতে লোভ হল। হাত বুলোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। হয়ত শুধু নিঃশ্বাসত্যাগই হবে, কিন্তু আজও আমার মনে পড়ে, এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠে ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিলাম যে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই প্রায় আটশ আশী গজ দূরে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। ঘটি করে বাবার মাথায় জল দিতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা পিসিমা। ঘটি ফেলে তিনি ছুটে এসে নিঃশ্বাসাহত ভাইপোকে রক্ষা করলেন। নিঃশ্বাস হয়ত অহিংস, কিন্তু ভয়াবহ ভঙ্গিতে প্রচণ্ডবেগে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা ধর্মের ষাঁড়ের পক্ষে অমার্জনীয়। সেটা অবদমিত হিংস্রতার অসংযত আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। অন্তত আমার তাই ধারণা এবং বদ্ধমূল ধারণা। শুধু তারকেশ্বরে নয়, কাশীতেও দেখেছি। সকলেই জানেন, ষাঁড় ও

সিঁড়ির জন্য কাশীধাম বিখ্যাত। সেখানেও দেখেছি, ধর্মের ষাঁড় হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে নিরীহ উত্তরভারতীয় বিশ্বনাথসেবককে অলিগলির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত তাড়া করে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। কাশীতেই বা কেন, কলকাতা শহরেও ধর্মের ষাঁড়ের অনেক কীর্তি দেখেছি। এককালে কলকাতা শহরে শত শত ধর্মের ষাঁড় ঘুরে বেড়াত। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আমলে তো বেড়াতই, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও বেড়াত। সেকালের সাহেবরা কলকাতায় মজা করে ধর্মের ষাঁড়ের লড়াই দেখতেন, আর বাঙালী বাবুরা দেখতেন বুলবুলির লড়াই, বড় জোর মেড়ার লড়াই। আমরাও পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় ধর্মের ষাঁড়ের লড়াই দেখেছি, অবশ্য দূর থেকে। কালীঘাটে ভৈরব নকুলেশ্বর আছেন, তাঁর একটি স্বনামধন্য ষাঁড় ছিল। আজও সেই ষাঁড়টির কথা আমার মনে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তাকে আর দেখিনি। বোধ হয় 'খাদ্যের ঘাট্‌তি' তাকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে।

ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক, সাধারণ লোকের তার প্রতি বেশ সহানুভূতি আছে দেখেছি। অথচ পশুসমাজে ষাঁড় 'প্রলেটারিয়েট' শ্রেণীভুক্ত নয়। রীতিমত মধ্যযুগীয় জমিদারের মতন চেহারা ধর্মের ষাঁড়ের। একমাত্র দেখেছি ষাঁড়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা মেয়েদের। কেন, জানি নে। অনেকদিন গভীরভাবে চিন্তা করেছি, মেয়েদের এই বৃষভবিদ্বেষের কারণ কি? সাইকোলজির বই উল্টে-পাল্টে দেখেছি, বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনি। অবচেতন মনের অতিরিক্ত অনুরাগ যদি সচেতন মনের তীব্র বিরাগে রূপান্তরিত হয়, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিরাগেরও তো একটা সীমা আছে। পুরুষের মতন পুরুষ, হয়ত বেকার অবস্থায় বিভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপিসে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন,

কে না তাঁর জন্য বেদনা বোধ করবেন? বেকার জীবনের জন্য তাঁর পৌরুষকে কেউ অস্বীকার করবেন না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বেকার যুবকরাই সবচেয়ে বেশী হাটে-মাঠে-ঘাটে পৌরুষ দেখিয়ে বেড়ান। অনেকে আবার আখড়াতে কুস্তী লড়েন, বার্বেল তোলেন, দম্বল ও মুগুর ভাজেন এবং হাতের গুল্ ও বুকের ছাতি ফুলিয়ে ট্রামে-বাসে চলেন। পথেঘাটে তাঁরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে বেড়ান, তবু যেহেতু তাঁরা কোন মার্চেন্ট আপিসে কেরানীগিরি বা টাইপিস্টের কাজ করেন না, সেই হেতু মেয়েরা নির্বিকারভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁদের 'ধর্মের ষাঁড়' বলে অভিহিত করে থাকেন। রোগা ডিগ্‌ডিগে কোন পুরুষ যদি চাকুরিজীবী হন, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি রূপকথার রাজকুমার হয়ে যান,—আর বলিষ্ঠ যুবক যদি চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, অথবা নিতান্ত চাকুরি না পেয়ে ক্লাব-বারোয়ারি-পলিটিক্স করে বেড়ান, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি 'ধর্মের ষাঁড়' উপাধি পান। এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। অথচ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরুষরা কোন প্রতিবাদ করেননি। ধর্মের ষাঁড়ের প্রতিবাদের ভাষা নেই কোন, তা না হলে প্রতিবাদ সেও করতে পারত। অন্তত মেয়েদের শিঙ দিয়ে গুঁতোতে পারত, নিদেন পক্ষে শিঙ নেড়ে তাড়াও করতে পারত। কিন্তু নির্বোধ ধর্মের ষাঁড় নির্বাক, তার ভাষা নেই, বোধশক্তি নেই। তা যদি থাকত, তাহলে তার করুণা হত মেয়েদের উপর। কারণ, যে-মেয়েরা তার মাথায় বিল্বপত্র ও ক্ষুরে গঙ্গাজলের অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই মেয়েরাই আবার তাকে সামাজিক জীবনে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করেন। কি বিচিত্র জীব! ধর্মের ষাঁড়ের কথা বলছি না, মেয়েদের কথা বলছি। ধর্মের ষাঁড়কে বোঝা যায়, মেয়েদের বোঝা যায় না। ষণ্ডচরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্র অনেক বেশী দুর্জ্ঞেয়।

শ্রদ্ধার পাত্র অর্থনৈতিক কারণে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন বাস্তব জীবনে। ধর্মের ষাঁড় তার চিরন্তন সাক্ষী। অন্তত মেয়েদের কাছে

যে হন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মের ষাঁড় চিরকালই বেকার। সনাতন বেকার-জীবনের প্রতিমূর্তি ধর্মের ষাঁড়। তবু সে মেয়েদের কাছে শ্রদ্ধেয়, কারণ তখন সে মহাদেবের অনুচর, নিত্যসঙ্গী ও বাহন। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাংসারিক জীবনে যখন সে বেকারত্বের প্রতিমূর্তি তখন সে অশ্রদ্ধা ও করুণার পাত্র এবং মেয়েদের কাছে তখন পুরুষ ও ধর্মের ষাঁড় অভিন্ন। "আমি মহাদেবের বাহন" বলে যদি কোন বেকার প্রেমভিক্ষা করেন, তাহলে এযুগের মেয়েরা তাচ্ছিল্য করে তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বলবেন "ধর্মের ষাঁড়"। শুধু ধর্মের ষাঁড় নয়, ষাঁড় ও ষণ্ডসহ অনেক 'শব্দ' মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। ক্রোধে বা অভিমানে নয়, অশ্রদ্ধায়। যেমন 'ষণ্ডামার্কা'। বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে বাইসেপের জোর বেশী, এরকম কোন বলিষ্ঠ যুবক দেখলেই মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে তাঁকে 'ষণ্ডামার্কা' বলে থাকেন। এই শ্রেণীর ষণ্ডামার্কাদের প্রতি অধিকাংশ মেয়েরই বিজাতীয় ঘৃণা আছে। তাই তাঁরা "ষণ্ডামার্কার" ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যন্ত একবারে ভুলে গেছেন। 'ষণ্ড' ও 'অমর্ক' নামে শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ছিল। কি কারণে শুক্রাচার্যের পুত্ররা ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হলেন জানিনে। 'ষণ্ডামর্ক' ক্রমে আ-কারের টানে হয়ে গেল 'ষণ্ডামার্কা'। মুনিপুত্র হয়েও ষণ্ড তার ষণ্ডত্ব হারাল না। অমৃতের পুত্ররা মেয়েদের কাছে 'ষণ্ডামার্কা' হয়ে গেলেন।

ধর্মের ষাঁড়ের প্রতি একজন মেয়ের মাত্র অনুরাগের কথা শুনেছি আজ পর্যন্ত। নাম উমা, গিরিরাজের কন্যা। আমাদের শিব ধর্মের ষাঁড়ের খুব ভক্ত, ষাঁড় না হলে তাঁর একদিনও চলে না। গাঁজা ও ধর্মের ষাঁড় তাঁর নিত্যসঙ্গী। দিগম্বর বেশে তিনি ভূতপ্রেতসহ শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান, যতসব কিরাত ডোম চাঁড়াল অসভ্যরা তাঁর

কে না তাঁর জন্য বেদনা বোধ করবেন? বেকার জীবনের জন্য তাঁর পৌরুষকে কেউ অস্বীকার করবেন না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বেকার যুবকরাই সবচেয়ে বেশী হাটে-মাঠে-ঘাটে পৌরুষ দেখিয়ে বেড়ান। অনেকে আবার আখড়াতে কুস্তী লড়েন, বার্বেল তোলেন, দম্বল ও মুগুর ভাজেন এবং হাতের গুল্ ও বুকের ছাতি ফুলিয়ে ট্রামে-বাসে চলেন। পথেঘাটে তাঁরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে বেড়ান, তবু যেহেতু তাঁরা কোন মার্চেন্ট আপিসে কেরানীগিরি বা টাইপিস্টের কাজ করেন না, সেই হেতু মেয়েরা নির্বিকারভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁদের 'ধর্মের ষাঁড়' বলে অভিহিত করে থাকেন। রোগা ডিগ্‌ডিগে কোন পুরুষ যদি চাকুরিজীবী হন, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি রূপকথার রাজকুমার হয়ে যান,—আর বলিষ্ঠ যুবক যদি চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, অথবা নিতান্ত চাকুরি না পেয়ে ক্লাব-বারোয়ারি-পলিটিক্স করে বেড়ান, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি 'ধর্মের ষাঁড়' উপাধি পান। এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। অথচ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরুষরা কোন প্রতিবাদ করেননি। ধর্মের ষাঁড়ের প্রতিবাদের ভাষা নেই কোন, তা না হলে প্রতিবাদ সেও করতে পারত। অন্তত মেয়েদের শিঙ দিয়ে গুঁতোতে পারত, নিদেন পক্ষে শিঙ নেড়ে তাড়াও করতে পারত। কিন্তু নির্বোধ ধর্মের ষাঁড় নির্বাক, তার ভাষা নেই, বোধশক্তি নেই। তা যদি থাকত, তাহলে তার করুণা হত মেয়েদের উপর। কারণ, যে-মেয়েরা তার মাথায় বিল্বপত্র ও ক্ষুরে গঙ্গাজলের অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই মেয়েরাই আবার তাকে সামাজিক জীবনে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করেন। কি বিচিত্র জীব! ধর্মের ষাঁড়ের কথা বলছি না, মেয়েদের কথা বলছি। ধর্মের ষাঁড়কে বোঝা যায়, মেয়েদের বোঝা যায় না। ষণ্ডচরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্র অনেক বেশী দুর্জ্ঞেয়।

শ্রদ্ধার পাত্র অর্থনৈতিক কারণে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন বাস্তব জীবনে। ধর্মের ষাঁড় তার চিরন্তন সাক্ষী। অন্তত মেয়েদের কাছে

যে হন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মের ষাঁড় চিরকালই বেকার। সনাতন বেকার-জীবনের প্রতিমূর্তি ধর্মের ষাঁড়। তবু সে মেয়েদের কাছে শ্রদ্ধেয়, কারণ তখন সে মহাদেবের অনুচর, নিত্যসঙ্গী ও বাহন। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাংসারিক জীবনে যখন সে বেকারত্বের প্রতিমূর্তি তখন সে অশ্রদ্ধা ও করুণার পাত্র এবং মেয়েদের কাছে তখন পুরুষ ও ধর্মের ষাঁড় অভিন্ন। "আমি মহাদেবের বাহন" বলে যদি কোন বেকার প্রেমভিক্ষা করেন, তাহলে এযুগের মেয়েরা তাচ্ছিল্য করে তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বলবেন "ধর্মের ষাঁড়"। শুধু ধর্মের ষাঁড় নয়, ষাঁড় ও ষণ্ডসহ অনেক 'শব্দ' মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। ক্রোধে বা অভিমানে নয়, অশ্রদ্ধায়। যেমন 'ষণ্ডামার্কা'। বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে বাইসেপের জোর বেশী, এরকম কোন বলিষ্ঠ যুবক দেখলেই মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে তাঁকে 'ষণ্ডামার্কা' বলে থাকেন। এই শ্রেণীর ষণ্ডামার্কাদের প্রতি অধিকাংশ মেয়েরই বিজাতীয় ঘৃণা আছে। তাই তাঁরা "ষণ্ডামার্কার" ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যন্ত একবারে ভুলে গেছেন। 'ষণ্ড' ও 'অমর্ক' নামে শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ছিল। কি কারণে শুক্রাচার্যের পুত্ররা ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হলেন জানিনে। 'ষণ্ডামর্ক' ক্রমে আ-কারের টানে হয়ে গেল 'ষণ্ডামার্কা'। মুনিপুত্র হয়েও ষণ্ড তার ষণ্ডত্ব হারাল না। অমৃতের পুত্ররা মেয়েদের কাছে 'ষণ্ডামার্কা' হয়ে গেলেন।

ধর্মের ষাঁড়ের প্রতি একজন মেয়ের মাত্র অনুরাগের কথা শুনেছি আজ পর্যন্ত। নাম উমা, গিরিরাজের কন্যা। আমাদের শিব ধর্মের ষাঁড়ের খুব ভক্ত, ষাঁড় না হলে তাঁর একদিনও চলে না। গাঁজা ও ধর্মের ষাঁড় তাঁর নিত্যসঙ্গী। দিগম্বর বেশে তিনি ভূতপ্রেতসহ শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান, যতসব কিরাত ডোম চাঁড়াল অসভ্যরা তাঁর

অনুরক্ত সহচর। অভিজাতদের তিনি ধার ধারেন না, 'বুর্জোয়া' ভদ্রতাভব্যতাও জানেন না। ষাঁড়ের পিঠে চড়ে, ববম্ ববম্ বম্ শিঙা বাজিয়ে, পাকা 'বুর্জোয়া' আর্য মুনিঋষিদের যাগযজ্ঞ পণ্ড করে বেড়ান। একেবারে প্রলেটারিয়েটের দেবতা শিব, নিজেই প্রায় ধর্মের ষাঁড়, নিত্যসঙ্গীও তাঁর ষাঁড়। এ-হেন কোন আধুনিক বেকার শিবকে কোন উমা বা গৌরী জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করবেন না, ধর্মের ষাঁড় বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যাবেন। আমাদের শিবকে গিরিরাজকন্যা গৌরী পছন্দ করেছিলেন। সেটা যে সম্পূর্ণ নারদের ঘটকগিরির ক্রেডিট্ তা নয়, কিছুটা অনুরাগ গৌরীরও ছিল। তা না হলে বৃদ্ধ নারদের সরস প্রস্তাব শুনে তিনি মা মেনকার কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কথাটা বলতেন না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, হিমালয়ের পাদদেশেও শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং গৌরী পাহাড়ের ফাঁকফোঁক দিয়ে দেখতেন। অনুরাগ বা পূর্বরাগ যাই বলুন, আগেই জন্মেছিল। তাছাড়া পাহাড়ীরা এ-ব্যাপারে এমনিতেই ফ্রি। গৌরী গিরিরাজ-কন্যা, শিবও কিরাতবেশী ও কিরাতবংশীয়। কথা হচ্ছে ষাঁড় নিয়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন, ষাঁড়ের জন্ম বা উৎপত্তি পার্বত্য অঞ্চলেই হয়েছিল। আমাদের ভারতীয় ষাঁড়ের পূর্বপুরুষরা এককালে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে বিচরণ করে বেড়াত। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে ষাঁড় ও গাভী উভয়েই গৃহপালিত হয় আফগানিস্থান ও মধ্যএশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। পীক্ ও ফ্লুর মনে করেন যে পার্বত্য অধিবাসীরা ছাড়া ষাঁড় ও গাভীর মতন অমন ধীরস্থির প্রকৃতির পশুপালন অন্য কোন জাতির দ্বারা সম্ভব নয়। পার্বত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, সেইজন্য তাদের পালিত ষাঁড় ও গাভীও ধীর স্থির শান্ত ও সরল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গৌরী শিব ও তাঁর ষাঁড় সকলেই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। শিব যে ষাঁড়ের কেন এত ভক্ত তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। স্বদেশবাসীপ্রীতিই শিবের বৃষভানুরাগের প্রধান

কারণ। শিব ও ষাঁড় উভয়ের স্বভাবচরিত্রের সাদৃশ্যও সেইজন্য এত স্ট্রাইকিং। ধর্মের ষাঁড় এমনিতেই অত্যন্ত নিরীহ, শান্তশিষ্ট, স্বল্পে তুষ্ট, ধ্যানগম্ভীর ও উদাসীন, কিন্তু কোন কারণে ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। শিবও ঠিক তাই। একেবারে সদাশিব, শান্ত, উদাসীন। কোন জুলুম নেই, দাবীদাওয়া নেই। সামান্য বিল্বপত্র ও একটু গঙ্গাজল মাথায় পড়লেই তুষ্ট। কোন 'ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স' চান না। কিন্তু ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী স্মরণ করলেই শিবের রুদ্রমূর্তি মনে পড়বে। তাছাড়া, ছোক্‌রা মদনের ইয়ার্কির ফলাফলের কথা তো সকলেই জানেন। মদন ফাজলামি করতে গিয়েছিলেন শিবের সঙ্গে, একেবারে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেলেন। ধর্মের ষাঁড়েরও অবিকল এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেছি। জনৈক ছোক্‌রা একবার একটি ধর্মের ষাঁড়ের শিঙে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করতে গিয়েছিল। ফঁস্‌ফঁস্ শব্দে শিঙ বেঁকিয়ে ধর্মের ষাঁড়টি তাকে মাইল তিনেক তাড়া করে নিয়ে গিয়ে একটা পাঁচিলের গায়ে খুব কসে চট্‌কান দিয়ে শেষে তুলে সজোরে ধোপাই আছাড় দিয়েছিল।

শিব ও ষাঁড়ের পারস্পরিক প্রীতির কারণ গভীর। উভয়েই একই পার্বত্যদেশের অধিবাসী, এবং উভয়েরই স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এক। আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিম পুরুষ শিব এবং আদিম জন্তু তাঁর অনুচর ও বাহন ষাঁড়। গৌরীও পার্বত্য অঞ্চলের কন্যা। মহেঞ্জদড়োতে শিবও ছিলেন, ষাঁড়ও ছিলেন। ভারতের সর্বত্র যেখানে শিব আছেন, সেখানে ষাঁড়ও আছে। ষাঁড়ের প্রতি গৌরীরও অনুরাগ ছিল, ষাঁড়ের ভক্ত শিবের প্রতি তো ছিলই। শিব যখন গৌরীকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন তখনও ষাঁড়টিকে সঙ্গে নিতে ভোলেননি। শিব বিবাহ করতে চলেছেন, সঙ্গে বর-যাত্রীরা চলেছে। বরযাত্রীরা হল ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যাদি। মহা স্ফূর্তিতে তারা চলেছে। গিরিরাজ পুরোহিত নিয়ে বসে অপেক্ষা করছেন।

এমন সময়—

বলদে চড়িয়া শিঙা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ।
যত কনাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে
না সরে কারো উত্তর।

(ভারতচন্দ্র)

শিবের বিবাহে ষাঁড়ের মহাস্ফূর্তি। ঘাড় নেড়ে মহা উল্লাসে ষাঁড় নাচতে আরম্ভ করল, দাদাবাবুর বিয়েতে প্রভুভক্ত ভৃত্য যেমন নাচে তেমনি—

নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাচে।
কি উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাস যাচে॥

(ঈশ্বর গুপ্ত)

বিবাহ হল এবং বিবাহের পর যা আমাদের সকলের হয়ে থাকে তাই হল। হরগৌরীর প্রেমের রং ক্রমেই চট্‌তে লাগল। শুরু হল ঝগড়া। পাহাড়ী মেয়ে গৌরী, সুতরাং কোঁদলের ঝাঁঝও উগ্র। তিনি বলতে লাগলেন—

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥

(ভারতচন্দ্র)

সেই অর্থনৈতিক কারণ, সনাতন কারণ যার জন্য শাশ্বত প্রেমও শেয়ালকাঁটার মতন গায়ে বিঁধতে থাকে। শিব গালাগাল সহ্য করতে পারলেন না। ধর্মের ষাঁড়ও 'বুড়া গরু' বক্রোক্তিতে বিরক্ত হল। শিব সংসার ছেড়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে যাবেন মনস্থ করলেন—

হেঁট মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।

(ভারতচন্দ্র)

লক্ষণীয় হচ্ছে, ষাঁড়ের কথা শিব ভুললেন না। আবাল্য সহ-চরের নিন্দা নিশ্চয় তাঁর পছন্দ হয়নি। নন্দী আদেশ পালন করল। কেউ কেউ ক্ষুব্ধ শিবকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে উত্তর দিলেন—

যত আনি তত নাই   না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এঘরে থাকিয়া
এত বলি দিগম্বর   আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।

(ভারতচন্দ্র)

ধর্মের ষাঁড়ের রহস্য এবার নিশ্চয় পরিষ্কার হল। প্রেমিকের নিত্যসঙ্গী ধর্মের ষাঁড় যদি সাংসারিক জীবনে গৌরীর কাছেও 'বুড়া গরু'তে পরিণত হয়, তাহলে এযুগের বেকার পুরুষরা আধুনিক গৌরীদের কাছে 'ধর্মের ষাঁড়' হবেন না কেন? কারণ সবক্ষেত্রে একই। অর্থ-নৈতিক কারণ। সুতরাং বেকার পুরুষরা মেয়েদের 'ধর্মের ষাঁড়' বক্রোক্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন না। মনে মনে এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পাবেন যে—যে-মেয়েরা অর্থনৈতিক কারণে 'ধর্মের ষাঁড়' বলে তাঁদের উপেক্ষা করেন, সেই মেয়েরাই আবার আধ্যাত্মিক কারণে সেই ষাঁড়ের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে কৃতার্থ হন। বিচিত্র জীব! ধর্মের ষাঁড় নয়, এই মেয়েরা!

২

ছাইকোলজি

এতদিন একটা বস্তু ছিল, যা নিয়ে আমরা রঙবেরঙের কল্পনার সূক্ষ্ম মস্‌লিন বুনতে পারতাম। বস্তুটি হল 'মন'। অবশ্য মনটাকে বস্তু বললে আজও হয়ত কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেও নিস্তার নেই। মন আর সে-মন নেই। মনোবিদ্‌রা মনের বোর্‌খাটি আজ খুলে ফেলে দিয়েছেন। "কি জানি কার মনে কি আছে"—একথা আগেকার মতন আজ আর বলা যায় না। যার মনে যাই থাক না কেন, সবই আজ জানা যায়, বলা যায়। এমনকি, মনে যা নেই তাও সমীক্ষণ করে বলে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। আগে "কার কি মনে আছে, কে জানে" বলে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম; এখন "যার মনে যা আছে, সব জানা আছে" বলে মুচকি হাসি। আমরা জানি না আমাদের মনে কি আছে, অথচ মনোবিদ্‌রা জানেন। তাঁরা জানলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ বিশেষজ্ঞ তাঁরা, মন নিয়ে করবার করেন, জানাটা তাঁদের পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে জানেন। সকলের জানাজানির ফলে মনের অবস্থা হয়েছে ঠিক মেসের বারোয়ারি ছাতির

মতন—যার যখন খুশি টান দিয়ে মাথায় দিচ্ছেন। মনোবিদ্ আজ আমরা সকলেই, সমীক্ষণবিদ্যায় পারদর্শী। লক্ষদুয়ারী মনের অনেক রুদ্ধ দরজা মনোবিদ্‌রা খুলে ফেলেছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও অনেক দরজায় তাঁরা মাথা খুঁড়ে মরছেন, ভিতরের গভীর অন্ধকারের রহস্য কিছুই জানেন না। অথচ আমরা সব জেনে ফেলেছি। জেনে ফেলে এত বেশী বাড়াবাড়ি করছি পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে সর্বত্র, যে 'মন' আজ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। এতদিন আমাদের মনের অন্দরমহল পর্যন্ত একজনের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল, তিনি ভগবান। এখন মনের অলি-গলি পর্যন্ত সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ, সকলেই ভগবান। যাই হোক তবু নিজের বলতে ঐ মনটাই ছিল, অবশেষে তাও গেল।

বেশ বোঝা যায়, 'সাইকোলজি'র যুগে বাস করছি আমরা। হাড়ে হাড়ে প্রত্যেকেই সেটা বুঝতে পারছি। সাইকোলজির খৈ ফুটছে মুখে। 'সাইকোলজি' কথাটাই ধরুন না কেন। এমন জায়গা নেই এবং এমন মুখ নেই যে শোনা যায় না। বাজারে সাইকোলজি, বাসে সাইকোলজি, অফিসে সাইকোলজি, বৈঠকে সাইকোলজি। "সাইকোলজি দেখলেন তো?" "ভদ্রলোকের সাইকোলজি বুঝলেন?" "মেয়েটির সাইকোলজি বুঝে ফেললাম"—। এই ধরনের সব কথা এবং কথায় কথায় কেবল সাইকোলজি। কথাটার অর্থ হল "মনোবিজ্ঞান" বা "মনস্তত্ত্ব"। কোন ভদ্র-লোকের বা ভদ্রমহিলার "মনোবিজ্ঞান" বলতে কি বোঝায় জানি না। আপনার শরীরটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে—কথাটা এইভাবে না বলে যদি কেউ বলেন, "আপনার ফিজিওলজিটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে"—তাহলে কি রকম শোনায় বলুন তো? বাড়িতে আপনি পশুপক্ষী পোষেণ, ওটা আপনার 'হবি'। কিন্তু সেটা আপনার 'জুলজি'-প্রীতি বলে যদি কেউ ব্যাখ্যা করেন তাহলে কি মনে হয় আপনার? 'সাইকোলজিও' তাই। কথায় কথায় যখন আমার সাইকোলজিটা আপনি বুঝে ফেলেন তখন আমার মনে হয় আপনার

ফিজিওলজিতে বেশ গণ্ডগোল আছে এবং আপনি জুলজির একটি বিচিত্র জীববিশেষ।

শুধু কি সাইকোলজি! মনঃসমীক্ষণের বাছা বাছা সব কথার অবস্থা হয়েছে ঠিক ঘষা পয়সার মতন। যেমন ধরুন, ম্যানিয়া, ফোবিয়া, কম্প্লেক্স, নিউরসিস, অবসেসন, পারভার্সান ইত্যাদি। ম্যানিয়া ফোবিয়া তো মুখের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি গান ভালবাসেন তাহলে বুঝতে হবে যে গান সম্বন্ধে আপনার ম্যানিয়া আছে, আর যদি অহরহ গুন্‌গুন্ করেন তাহলে তো কথাই নেই। যাঁরা ক্লাসিকাল গান শুনতে ভালবাসেন তাঁদের ক্লাসিকাল-ম্যানিয়া এবং যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী তাঁদের রবীন্দ্র-ম্যানিয়া আছে। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা সম্বন্ধে ভীতিটাও আপনার অসংখ্য ফোবিয়ার মধ্যে একটি। এইভাবে দেখতে পাবেন, চলার পথে পদে পদে আপনার কত রকমের ম্যানিয়া ও ফোবিয়া আছে, যা আপনি জানেন না, অন্যেরা জানেন। ভিড় দেখলে বাসে ওঠেন না, সেটা আপনার সুস্থ মনের পরিচয় নয়, ক্রাউড-ফোবিয়া। পকেটমারদের পকেট-কাটার অভ্যাসটাকেও কতকটা 'ম্যানিয়া' বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। চুরি করাটাই তো একটা ম্যানিয়া। না বলে পরের দ্রব্য নিতে নিতে অভ্যাসটা এমন হয়ে যায় যে পরে সদিচ্ছা থাকলেও বলে নেবার কথা আর মনে থাকে না। এইভাবে নিতে নিতে ক্রমে পরের দ্রব্য নিজের বলে মনে হতে থাকে। তখনকার অবস্থাটাকে তুরীয় অবস্থা বলতে পারেন। তখন চুরি আর চুরি থাকে না, ম্যানিয়া হয়ে যায়—'ক্লেপ্টোম্যানিয়া'। এই রকম, আমাদের সমস্ত কাজকর্মই দেখা যায়, হয় ম্যানিয়া, না হয় ফোবিয়া। অনেকে দেখবেন, ঘুরে ঘুরে সস্তায় জিনিস কিনে বেড়ান—পোস্তার বাজার থেকে আলু, মশলাপাতি, হাটখোলা থেকে ডাল, হাতিবাগান থেকে মাছ, হাওড়া থেকে কাপড় ইত্যাদি। সেটা তাঁদের রুচি বা বিলাসিতা নয়, ম্যানিয়া—"ওনিওম্যানিয়া" বলা যেতে পারে।

SENIOR ... GE BANIPUR

আপনি প্রাণখুলে ঘুরে বেড়াতে চান—সেটা আপনার "ড্রোমো-ম্যানিয়া"। পার্কে পার্কে বৃদ্ধরা যে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ান, সেটা তাঁদের সুস্থ মনোবৃত্তি না হয়ে "পোরিওম্যানিয়া" হতে পারে। রুদ্ধ ঘরে বন্দী হয়ে না থেকে মুক্ত আলোবাতাসে হাত-পা ছেড়ে থাকতে চান, সেটাও আপনার সুস্থ বাসনা নয়—"ক্লস্ট্রোফোবিয়া"। এইভাবে যদি তলিয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, আপনি সুস্থ নর্মাল মানুষ নন, ম্যানিয়া ও ফোবিয়ার বাণ্ডিল মাত্র।

নিউরসিস ও কম্‌প্লেক্সেরও সেই অবস্থা। প্রতিদিন রেডিও শুনতে শুনতে আপনার মধ্যে যে রেডিও-কম্‌প্লেক্স গড়ে উঠেছে, তা আপনি নিজেই জানেন না। আর নিউরসিসের তো আপনার অন্ত নেই। কেবল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই যে কত লোকের কত রকমের নিউরসিস আছে তার ঠিক নেই। আমি এক ভদ্রলোকের 'ভেট্‌কি-নিউরসিস' দেখেছিলাম, ভুলব না কোনদিন। একদা একত্রে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় না-জেনে ভেট্‌কির ফ্রাইয়ের কথা বলতেই দেখলাম ভদ্রলোক হাতগুটিয়ে বসে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগলেন। অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় হোস্টেস্ হাসতে হাসতে বললেন: "মিস্টার ব্যানার্জির ভেট্‌কি-নিউরসিস আছে, জানেন না?" "আজ্ঞে, না" বলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলাম। তখন বুঝলাম, কেন মিসেস রায় নিমন্ত্রণ করার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনার কি কি নিউরসিস আছে বলুন!" হঠাৎ প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার একটিমাত্র নিউরসিস সম্বন্ধে আমি বরাবরই সচেতন—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে 'মাথা চুলকানো'—'হেয়ার-স্ক্র্যাচিং নিউরসিস' বলতে পারেন। অতএব মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম: 'এই যা দেখছেন, এই একটিই আমার আছে এবং এইটির জন্যে আমার কেরিয়ার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ে বাতিল হয়ে গেছি।' শুনে তিনি বললেন: 'ওসব না, ও দিয়ে আমার কি হবে? আমি বলছি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে

Date 28.11.2007

কিছু আছে কি না! এই ধরুন যেমন—চিংড়ি-নিউরসিস, তোপ্‌সে-নিউরসিস, পটল-নিউরসিস ইত্যাদি।' বুঝলাম, নিউরসিস রান্নাঘরেও ঢুকেছে, আর রেহাই নেই।

তারপর ধরুন—'অবসেসন্‌'। বদ্ধমূল ধারণা বলতে যা বোঝায়, অবসেসন হল কতকটা তাই। কিন্তু ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ধারণা মাত্রই অবসেসন হয়ে উঠছে। আমার আপনার ধারণা আমরা "ভদ্রলোক" এবং সেটা বদ্ধমূল ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে ওটা আমাদের একটা অবসেসন, তাতে সন্তুষ্ট হবার কোন কারণ আছে কি? ভদ্রতা সম্বন্ধে আপনার একটা অবসেসন আছে বলেই আপনি সর্বদা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেন, এটা আর যাই হোক, কমপ্লিমেণ্ট নয়। পিতার 'সত্য কথা' সম্বন্ধে অবসেসন আছে বলে তিনি পুত্রকে সদা সত্য কথা বলতে বলেন—এমন কথা কোন পুত্রের পক্ষে বলা কি সমীচীন? অবসেসন সম্বন্ধে একটি ছোট্ট গল্প বলি শুনুন। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমাদের বটুদা তিন-তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করবার পর চতুর্থবার যখন পরীক্ষা দেন তখন বানান ভুলের জন্য জ্যাঠামশায়ের কাছে একদিন প্রচণ্ড কানমলা খান। বটুদার বানান সম্বন্ধে নিজস্ব একটা থিওরী ছিল—যেমন উচ্চারণ, তেমনি বানান, বোঝা গেলেই হল। 'হি গোজের' গোজ্‌ বানান তিনি অবলীলাক্রমে জি-ও-এস্‌-ই লিখতেন এবং 'নোজ' লিখতে হলেই এস্‌-এর আগে 'ই' বসিয়ে এন্‌-ও-ই-এস্‌ করতেন। এইরকম সব বানান ভুলের জন্য জ্যাঠামশায়ের কাছে একদিন কানডলা খেয়ে বটুদা দেখি গুম্‌ হয়ে বসে বইয়ের মার্জিনের সাদা কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকিয়ে কান খুঁটছেন। এটা বটুদার অভ্যাস বা ম্যানিয়া বলতে পারেন। সেইজন্য তাঁর কোন পাঠ্যপুস্তকের ছাপান অক্ষরের অংশটুকু ছাড়া, মার্জিন বলে কিছু থাকত না। যাই হোক, বটুদার গুমোট ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কি হয়েছে বটুদা?' গম্ভীরকণ্ঠে বটুদা উত্তর দিলেন: "আর বলিস কেন?

জ্যাঠামশায়ের বানান সম্বন্ধে একটা মারাত্মক অবসেসন আছে বুঝলি ? তার জন্যে আমার কান চুল সব উপড়ে ফেলার উপক্রম করেছেন। কি করা যায় বল্‌তো ?” স্তম্ভিত হয়ে বললাম : “অবসেসন ?” বটুদা বললেন : “তা ছাড়া কি ? দুনিয়াতে সব বদলে যাচ্ছে—আজ যা আছে, কাল তা নেই—স্বয়ং স্ট্যালিনই থাকছেন না—আর জ্যাঠামশায়ের ধারণা বানান fixed থাকবে।” খুব ঠিক কথা—সবই যদি বদলায়, বানান বদলাবে না কেন ? সত্যি, বানান সম্বন্ধে কারও কোন অবসেসন্ থাকা ঠিক নয়, ব্যাকরণ সম্বন্ধে তো নয়ই। বটুদার কথায় সায় দিয়ে উঠে গেলাম .

ক্ল্যাইম্যাক্স হল, স্নেহ ভালবাসা প্রেমের পরিণতি। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কাছে এসবও ‘অবসেসন’ বা ‘ম্যানিয়া’ ছাড়া কিছু নয়। নায়ক যদি নায়িকাকে বলেন : ‘মেঘে মেঘে, গাছের পাতায় পাতায়, ফলে ফুলে, মাঠে মাঠে, জানলার গরাদে, ঘরের সিলিঙে—যেদিকে যখন চাই, তোমারই মুখ দেখতে পাই, সানাই।’—তখন নায়িকা সানাই ভীম-পলশ্রী রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠেন না। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলেন : ‘বলছ কি মৃদঙ্গ ? এখনই কোন ক্লিনিকে যাও। তুমি তো মারাত্মক ‘অবসেসনে’ ভুগছ—প্যাথেটিক ইরটোম্যানিয়াক্।’

বুঝুন অবস্থা। মনঃসমীক্ষণ ভাল, কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফল ভয়াবহ। বাড়াবাড়ি করে গোটা সমাজটাকেই আজ আমরা একটা “মেন্টাল হসপিটালে” পরিণত করেছি। কেউ ম্যানিয়ায়, কেউ ফোবিয়ায়, কেউ নিউরসিসে, কেউ কম্‌প্লেক্সে, কেউ বা অবসেসনে ভুগছি। চিকিৎসা করার কেউ নেই।

৩

ভদ্রলোক ভেসে যায়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন কলেজের এক ছাত্র নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (মনোমোহন গাঙ্গুলির পিতা) লেখাপড়ার ব্যাপার শেষ করে, কাঠের ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। কলকাতায় নিমতলা অঞ্চলে তাঁর কাঠের গোলা ছিল। ব্যবসা বেশ ভালই করছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আগুন লেগে কাঠের গোলা পুড়ে যায়। নগেনবাবু মুশ্‌ড়ে পড়েন। ছাত্রের এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বিদ্যাসাগর মশায় একদিন নিমতলায় পাল্‌কি করে তাঁর কাঠের গোলা দেখতে যান। রাস্তায় তাঁকে দেখবার জন্য দুচারজন করে ক্রমে লোকের ভিড় জমতে থাকে। ভিড় দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এত ভিড় কেন?' নগেনবাবু উত্তর দেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছে'। 'তাই নাকি? ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা,' বলে বিদ্যাসাগর মশায় হাসতে থাকেন। এই-ভাবে কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাসের পর তিনি গম্ভীর হয়ে তাঁর ব্যবসায়ী ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করেন—

'কিভাবে ব্যবসা করিস নগেন?

'আজ্ঞে ধারেও বেচি, নগদেও বেচি'

'ধার কাকে দিস' ?

'ভদ্রলোক দেখে দিই'

'কি করে বুঝিস ভদ্রলোক' ?

'আজ্ঞে, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়'

'দূর মুখ্‌খু, তোর দ্বারা ব্যবসা হবেনা, ছেড়ে দে। চেহারা দেখে ভদ্রলোক চেনা যায় ? ভদ্রলোক চিনবি ব্যবহারে, চেহারায় নয়।'

১৮৮২-৮৩ সালের কথা। ভদ্রলোক-বিচারের মানদণ্ড তখন অনেক বদলে গেছে। পরিবর্তনের সেই ধারার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ১৮৮২ সালে তিনি তাঁর ছাত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন, ব্যবহার দেখে ভদ্রলোক চিনতে, চেহারা দেখে নয়। চেহারা বলতে পোষাক-পরিচ্ছদের কথাও বোঝায়। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশেও "ভদ্রলোকের" সংজ্ঞা বা ডেফিনিশন বদলাতে আরম্ভ করেছিল দেখা যায়। ভদ্রলোকত্বের মানদণ্ডের মধ্যে জোর দেওয়া হচ্ছিল ব্যবহারের উপর, পোষাক বা চেহারার উপর নয়। কিন্তু—

পরিবর্তনের স্রোতে

ভদ্রলোক যায় ভসে

কালের যাত্রায়—

পরিবর্তনশীল সমাজের ভদ্রলোকও পরিবর্তনশীল। অতীতে যাঁরা সমাজে 'ভদ্রলোক' বলে গণ্য হতেন, বর্তমানে তাঁদের বংশধররা অনেকেই আর তা হন না। ভদ্রলোকের এই পরিবর্তনশীলতার তাৎপর্য নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন তল খুঁজে পাননি। অতলস্পর্শ সামাজিক তাৎপর্য এই "ভদ্রলোক" কথাটির। ভদ্রলোকরা তা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি বলে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারছেন। "ভদ্রলোক" সম্বোধনেই তাঁরা খুশি। কেন ভদ্রলোক, তা তাঁরা জানেন না, জানবার

প্রয়োজনবোধও করেন না। যাঁরা ভদ্রলোকের উৎসসন্ধানে যাত্রা করেছেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। বাঙালী সমাজের কথা পরে বিচার্য। তার আগে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয়, মানুষের সমাজে 'ভদ্রলোক' নামে শ্রেণীর উৎপত্তি হল কোন্ সময় এবং কি কারণে হল ? ভদ্রলোকরা কোন নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিনা ? কি কি গুণ থাকলে ভদ্রলোক হয় ? কোন সমাজবিজ্ঞানী এসব কথার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি, অথচ "ভদ্রলোকতত্ত্ব" বা 'থিওরি অফ্ জেণ্টলম্যান' বলে নতুন এক তত্ত্ব-কথার উৎপত্তি হয়েছিল একসময়। সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানীরা বিচার করে দেখেছেন, ভদ্রলোকের যতগুলি গুণ বা ক্রাইটেরিয়া আছে তার কোনটারই স্থিরতা নেই। যেমন, বিদ্যাসাগর মশায় বলেছেন, ব্যবহারে ভদ্রলোক চেনা যায়। ঠিক কথা। পোষাক বা চেহারা ভদ্রলোকের মাপকাঠি নয়। তা যদি হয়, তাহলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন অনেক শীর্ষস্থানীয় ভদ্রলোকদের ভদ্রশ্রেণী ছাড়া অন্য যে-কোন শ্রেণীভুক্ত করতে হয়। কিন্তু এমন কোন অভদ্রলোক আছেন কিনা জানিনা, যিনি চেহারা ও পোষাকের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন পুরুষকে 'ভদ্রলোক' বলতে রাজি হবেন না। চেহারা বা পোষাকের সঙ্গে ভদ্রলোকত্বের বাস্তবিকই কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তাই বলে, বিদ্যাসাগরের 'ব্যবহার' মানদণ্ডটিও যে খুব নির্ভরযোগ্য, তা মনে হয়না। মুখে যিনি মিছরির মতন মিষ্টি, মনে মনে শাণিত ছুরির মতন ভয়াবহ, তিনি কি ভদ্রলোক ? সাধারণত যাঁকে আমরা ভদ্রলোক বলতে চাই না, তাঁর সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলি—'ব্যবহারটি এমন, একেবারে অমায়িক ভদ্রলোকের মতন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে লোকটি মূর্তিমান ছোটলোক, চামার।' সুতরাং বিদ্যাসাগর মশায়ও ঠিক কথা বলেননি। পোষাক বা চেহারা দেখে ভদ্রলোক চেনা যায় না যেমন, ব্যবহার দেখেও তেমনি বোঝা যায় না। মানুষের সমাজে 'ভদ্রলোক' নামে জীবরা হলেন আলেয়ার মতন। তাঁদের কেবল চলে ফিরে

বেড়াতে দেখা যায়, ধরাছোঁয়া যায় না। যত কাছে যাওয়া যায় তত তাঁরা ভদ্রলোকের কল্পিত সীমারেখা থেকে দূরে সরে যান, অর্থাৎ তত তাঁদের 'অভদ্র' বলে মনে হয় এবং যত দূরে যাওয়া যায় তত মনে হয় ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। আরও আশ্চর্য হল, সকলকে তা মনে হয় না। একজাতের ভদ্রলোক আছেন, যাঁদের ঠিক উল্টো মনে হয়। অর্থাৎ যত কাছে যাওয়া যায় তত মনে হয় কত ভদ্র, আর যত দূরে সরে যাওয়া যায় তত মনে হয়, কি অভদ্র। পোষাক, চেহারা, ব্যবহার, অর্থ ও কুলকৌলীন্য কোনটাই ভদ্রলোকত্বের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়। একটি ছেড়ে অন্যটি ধরা যায় না। সব কটি গুণ থাকলে পুরো ভদ্রলোক হওয়া যায়, কিন্তু সেরকম ভাগ্য করে খুব কম ভদ্র-লোকই জন্মগ্রহণ করেন। যুগে যুগে তাই দেখা যায়, এইসব ভদ্রলোকত্বের মানদণ্ড অনুযায়ী ভদ্রলোকের সংজ্ঞা বদলেছে। এক-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই গুণ থাকলে ভদ্রলোক হওয়া যায়। তারপর আবার সেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলেছে এবং ভদ্রলোকেরও পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলা 'ভদ্রলোকের' ইংরেজী কথা হল 'জেণ্টেলম্যান'। ফরাসী কথা 'Gentilhomme,' ইটালীয় কথা 'Gentiluomo'—দুয়েরই সম্পর্ক আছে কুলকৌলীন্যের সঙ্গে। ল্যাটিন 'Gentis' কথাও পরিবার ও কুলসূচক। সামাজিক ইতিহাসের দূর অতীতের দিকে যত পিছিয়ে যাওয়া যায়, তত দেখা যায় কুলকৌলীন্যের উপর গুরুত্ব বেশি আরোপ করা হয়েছে এবং শেষে 'কুল' আর 'ক্ল্যানের' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ট্রাইবাল সমাজেও ক্ল্যানভেদে মর্যাদাভেদ আছে, আমাদের সমাজের বর্ণগত পার্থক্য তারই একটু মার্জিত রূপ মাত্র। ফিউডাল-যুগে রাজাবাদশাহরা সম্পত্তি ও খেতাব দিয়ে এই মর্যাদাকে কুলানু-ক্রমিক করতেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগে আভিজাত্যের কুলগত ভিত ভেঙে ফেলা হল, মানুষের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ও প্রতিভার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল বেশি। কিন্তু আর্থিক বা রাজনৈতিক ভিত

যত সহজে ভাঙে, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ভিত তত সহজে ভাঙে না। তাই নতুন যুগের সামাজিক ভাঙাগড়ার মধ্যেও পুরাতনের জের চলতে লাগল। আধুনিক ধনিকযুগের প্রথম পর্বে, সামাজিক রঙ্গমঞ্চে যাঁরা ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে অবতীর্ণ হলেন তাঁরা অনেকেই তাই ললাটে কুলতিলক পরেই এলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও একদল এলেন, বাণিজ্যলব্ধ বিত্তের জোরে, অথবা প্রতিভালব্ধ বিদ্যার জোরে। বিত্ত ও বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বও সামাজিক মর্যাদা দাবি করল, কুলকৌলীন্যের মতন। দাবি গ্রাহ্য হল, কিন্তু কুলের সনাতন দাবি একেবারে বাতিল করা হল না। অর্থ, কৃতিত্ব ও কৌলীন্য, তিনটিই নবযুগের ভদ্রলোক বিচারের মানদণ্ড হল।

কিন্তু তাতে ব্যাপারটা সহজ হল না, আরও জটিল হল এবং ফ্যাসাদও বাড়ল। ফিউডাল যুগে বরং ছিল ভাল। অভিজাত বংশের বংশধরদের চিনতে কষ্ট হত না। ভদ্রলোক নিয়ে তখন অত মাথাও ঘামাত না কেউ। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোন বিশেষ বালাই ছিল না তখন। ধনতান্ত্রিক যুগের একাধিক পরস্পর-বিরোধী মানদণ্ডের ফলে ভদ্রলোক চেনা ও বাছাই করা রীতিমত দায় হয়ে উঠল। কেন হয়ে উঠল, বলছি।

বাবুরামবাবু কাঁচা সরষে পিষে তেল বার করে, তাই বেচে বেশ পয়সা করেছেন। কলকাতা শহরে তাঁর চারখানা বাড়ি, তিনটে তেলের কল। ভদ্রলোকরা (বেকার) তাঁর কাছে গিয়ে ধর্না দেন। বাবুরাম বাবু নেংটির মতন গামছা পরে থাকেন, ঘন ঘন পানদোক্তা খান এবং পিক্ ফেলতে ফেলতে অমার্জিত ভাষায় ইতরের মতন কথা বলেন। এহেন বাবুরামকে কেউ 'ভদ্রলোক' বলতে রাজি হবেন না, এমনকি যে বেকার ভদ্রলোকরা দুবেলা চাকরির আশায় তাঁর কাছে ধর্না দেন, তাঁরাও না। তাহলে কেবল অর্থের সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্ক কোথায়? ভদ্রলোকত্ব অর্থের অতিরিক্ত কিছু। হেনরি পীচহ্যাম তাঁর 'পুরো ভদ্রলোক' (Compleat Gentleman, 1622) নামে

বইয়ের মধ্যে তাই স্পষ্ট করে বলেছেন : "Riches are an ornament not the cause of nobility." এখানে বাবুরামবাবুর চালচলন, পোষাক, আচরণ ইত্যাদি হল ভদ্রলোকভুক্ত হবার অন্তরায়। কেবল অর্থের জোরে তাই তিনি ভদ্রলোক হতে পারলেন না। কিন্তু নববাবু গ্যাবাডিনের স্যুট পরে, মটর হাঁকিয়ে বেড়ান। হঠাৎ চোরাবাজারের দালালি করে তিনি অর্থলাভ করেছেন। অর্থ, পোষাক, চেহারা সব থাকা সত্ত্বেও নববাবু ভদ্রলোকের সমাজে আপস্টার্ট বলে গণ্য হবেন, পুরো কেন, আধা-ভদ্রলোকের মর্যাদাও তাঁকে কেউ দিতে রাজি হবেন না। এখানে অভাব কিসের? চোরাবাজারের দালালি করে অর্থ রোজগার করাটাও এ-সমাজে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। নববাবুর চেহারা, পোষাক, অর্থ ছাড়াও কৃতিত্ব আছে। 'ভদ্রলোক' হতে কোন বাধা নেই। অথচ তাঁকে অবজ্ঞা করে আপস্টার্ট বলা হবে। এখানে বাধা হল বংশগত মর্যাদার। সুতরাং যেসব নীতিবাগীশরা বলেন, 'the clothes do not make the man', তাঁদের বাবুরামবাবুর কথা স্মরণ করে বোঝা উচিত, 'they do, however, make the gentleman' অর্থাৎ পোষাক দিয়ে লোক চেনা না গেলেও, ভদ্রলোক চেনা যায়। নববাবুর ক্ষেত্রে পীচহ্যামের কথাই ঠিক, কেবল টাকার জোরে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। অথচ টাকা, বংশমর্যাদা, পোষাক, আচারব্যবহার, কৃতিত্ব সবই থাকা দরকার, ভদ্রলোক হতে হলে।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ভদ্রলোকের ব্যাপারটাই গোলমেলে। চাষীকে চিনতে দেরি হয় না, মজুরকেও সহজে চেনা যায়। ধনিক বা অভিজাত লোক চিনতেও কষ্ট হয় না। কিন্তু ভদ্রলোক আধুনিক লোকসমাজে চেনা ও বাছাই করা দুরূহ ব্যাপার। যেসব মানদণ্ডের কথা বলেছি, বিচারবিশ্লেষণে তার কোনটাই ধোপে টেঁকে না। প্রত্যেকটি মানদণ্ড পরস্পরনির্ভর। কৃতী লোক হলেই হবে না, সদাচারী হওয়া দরকার। আবার কৃতী ও সদাচারী হলেই

হবে না, তার সঙ্গে অর্থেরও জোর খানিকটা থাকা দরকার। তবেই ভদ্রলোক হওয়া সম্ভব। আর্থার লিভিংস্টোন তাই বলেছেন :

"Achievement, however, has always been subject to good manners, and it must lead to wealth ; otherwise the genteel status is ephemeral,"

কৃতিত্বের সঙ্গে সদাচারের মিশ্রণ এবং উভয়ের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে মিলন হলে ভদ্রলোকের স্ট্যাটাস স্থায়ী হয়. তা না হলে, দুদিনের ভদ্রলোক হবার সম্ভাবনা।

ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমাদের যে সব নৈতিক ধারণা আছে তাও অধিকাংশই ভুল। নীতিতত্ত্বের সঙ্গে ভদ্রলোকতত্ত্বের কোন যোগসূত্র নেই। ভদ্রলোক হতে হলে যে নীতিবাগীশ হতে হবে, এমন কথা কেউ বলেন নি কখনও। ওটা নীতিবাদীদের উদ্ভাবন মাত্র। ভদ্রলোকদের যেদিন থেকে উদয় হয়েছে সমাজে, সেদিন থেকে তাঁরা সনাতন নীতিবিচার জলাঞ্জলি দিয়েছেন। পীচহ্যাম তাই নিয়ে দুঃখ করেছেন। বলেছেন যে মদ্যপান, মিথ্যাচার, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি কোন চারিত্রিক দোষই 'gentility' বা ভদ্রলোকত্বের অন্তরায় হয়নি কোনকালে। আমাদের বাংলাদেশের আধুনিক কালের ভদ্রলোকদের মধ্যে রামমোহন রায় অন্যতম। তিনি প্রচলিত নীতিবাদের ধার ধারতেন না। সমাজের অগ্রগণ্য নেতা হয়েও বাড়িতে বাইজী নাচাতে সঙ্কোচ হয়নি তাঁর। ইয়ং বেঙ্গল দলের সকলে নিশ্চয় বাঙালীদের মধ্যে সেরা ও সাচ্চা ভদ্রলোক ছিলেন। 'মোর‍্যালিটির' সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না বিশেষ। মাইকেল মধুসূদন তার চিত্র এঁকে গেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনের মধ্যে :

॥ নববাবু ॥ জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েচি ; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির

দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে ; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

॥ সকলে ॥ হিয়ার, হিয়ার।

॥ নববাবু ॥ কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্—অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট অস এঞ্জয় আওরসেল্ভস!

বাঙালী ভদ্রলোকের উৎপত্তির আভাস পাওয়া যায় এর মধ্যে। বিদ্যাবলে তাঁরা বলীয়ান, জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে তাঁরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে পথ চলেন এবং তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও নীতি হল—'In the name of freedom, let us enjoy ourselves.' তবে নববাবুর যুগের ভদ্রলোকদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? লক্ষ্য ও নীতির দিক থেকে পার্থক্য নেই। সেকালের ভদ্রলোকরা গর্ব করতেন যে বিদ্যাবলে তাঁরা কুসংস্কারের শিকলি কেটেছেন, এবং পুত্তলিকার কাছে দেবী বলে হাঁটু নোয়ান না। একালের ভদ্রলোকদের এটুকুও বড়াই করে বলবার মুখ নেই। বাছা-বাছা ভদ্রলোকেরা সব সাধুবাবাদের সামনে বিদ্যাবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেন নাড়ু-গোপালের মতন।

এসব দিকে ভদ্রলোকের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা অগ্রগতি নয়, অধোগতি। ভদ্রলোকের আসল যে সমস্যা, তারও যে কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে, তা মনে হয় না। ভদ্রলোকতত্ত্বের সবচেয়ে বড় কথা হল—'No gentleman works for a living', নিছক জীবনযাপনের গ্লানির জন্য ভদ্রলোকরা কোন কাজ বা মেহনৎ

করতে চান না। তাঁদের ভদ্রতার মর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। ভেবলেন (Thorstein Veblen) তাঁর বিখ্যাত বই "Theory of the Leisure Class"-এর মধ্যে ভদ্রলোকের এই মনোভাব সম্পর্কে অনেক প্রণিধানযোগ্য তত্ত্বকথা বলেছেন। ভদ্রলোকরা হাতের কাজ চিরকাল ঘৃণা করেন। দৈহিক পরিশ্রম করে যে কাজ করতে হয় সে কাজ তাঁরা অভদ্রলোকের কাজ বলে মনে করেন। বিচিত্র মনোভাব! কিন্তু এই মনোভাবটুকু বাদ দিলে ভদ্রলোকের আর কিছুই থাকে না। যে হাত দিয়ে ভদ্রলোক কেরানীরা কলম পেষেন, সেই হাত দিয়ে মজুররা কারখানায় যন্ত্র চালায়, হাতুড়ি পেটে, চাষীরা মাঠে লাঙল চালায়। হাতের কোন মহিমা নেই। কলমের সঙ্গে হাতুড়ি আর হালের তফাৎ আছে। তার চেয়েও বড় তফাৎ হল, আপিসের সঙ্গে কারখানার তফাৎ, আপিসের সঙ্গে মাঠের তফাৎ। সবচেয়ে বড় তফাৎ হল, কাজ সম্বন্ধে ধারণার। কলম পিষতে পিষতে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেলেও, কোন ভদ্রলোক সেই হাতে হাতুড়ি বা হাল ধরবেন না, স্ত্রীপুত্রপরিজন নিয়ে অনাহারে মরে গেলেও না। হাতের কাজ, দৈহিক মেহনতের কাজ, ভদ্রলোকের কাছে ট্যাবু। কেবল হাতের কাজ বা মেহনতের কাজ নয়, নিছক জীবনধারণের জন্য কোন কাজ করাকে একসময় ভদ্রলোকরা অবহেলা করতেন। উকিল ডাক্তাররা এইজন্য একসময় ভদ্রলোক বলে গণ্য হতেন না, কারণ তাঁরা নিছক জীবিকার জন্য বিদ্যার ব্যবসা করেন বলে। ভদ্রলোকের ইতিহাসে তাই চাকুরীজীবীরাই সম্মান পেয়েছেন বেশি, স্বাধীন বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরা তা পান নি। ডাক্তারদের মধ্যে সার্জেনরা হাতে অস্ত্র চালাতেন বলে, তাঁদের পরামাণিকের স্তরে ফেলা হত। পরে ডাক্তার উকিলের উপর থেকে ভদ্রলোকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যবসার প্রতি বীতশ্রদ্ধা মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বণিকশ্রেণীর প্রতি। আজও এই ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যবসায়ী-শ্রেণীকে ভদ্রলোকভুক্ত করতে ভদ্রলোকেরা রাজি নন

দেখা যায়। বড়বাজারের বিভিন্ন পট্টির কজন ব্যবসায়ীকে ভদ্রলোকরা স্বশ্রেণীভুক্ত করতে রাজি হবেন, বলা যায় না।

ভদ্রলোকদের এইজন্যই মনে হয় আলেয়ার মতন। বিচারের কোন মানদণ্ড দিয়েই ভদ্রলোক যাচাই করা যায় না। অর্থ নয়, কুল-কৌলীন্য নয়, ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, সদাচার শিষ্টাচার নয়, ভদ্র পোষাক পরিচ্ছদ নয়, সুনীতি দুর্নীতি নয়। ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে সব কটি মানদণ্ডই পরস্পর-নির্ভর। একটি ছাড়া অন্যটির কোন মূল্য নেই। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সমানাধিকারের যুগে ভদ্রলোকের মানদণ্ড বদলাচ্ছে ও বদলেছে। ক্রমেই ব্যক্তিগত গুণ ও কৃতিত্বই ভদ্রলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু তা হলেও, সেই বিত্তকৌলীন্য ও বংশকৌলীন্যের মধ্যযুগীয় প্রভাব আজও ভদ্র-সমাজে খুব বেশি। তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্য হল, গণতন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রের যুগেও ভদ্রলোকরা তাঁদের টিপিক্যাল শ্রমবিমুখ মনোভাব ত্যাগ করতে পারেন নি। নিছক জীবিকার জন্য, জীবনযাপনের গ্লানির ধিক্কারে, তাঁরা আজ কারখানার মজুরশ্রেণীর সঙ্গে পা-মিলিয়ে মিছিল করছেন। পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ ও মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। ভদ্রলোকত্ব বজায় রাখবার জন্য সপরিবারে তাঁরা আত্মহত্যা করবেন, তবু 'gainful employment' ছাড়া অন্য কোন কাজ সানন্দে করতে চাইবেন না, কিছুতেই মজুরের মেহনতের সমান মর্যাদা দেবেন না নিজেদের মেহনতের সঙ্গে। আর্থিক দুর্গতির চাপে ভদ্রলোকেরা আজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাঁদের মনোভাব প্রায় স্থিতিশীল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বাঙালী সমাজের ভদ্রলোকদের মধ্যে মনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে মনে হয়। জেন্টিলিটির বাহ্য paraphernalia পর্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখানে তা আলোচনা করার অবকাশ নেই। নির্দয় সামাজিক শক্তির চাপে ভদ্রলোকেরা আজ পরিবর্তনশীল হলেও, যেসব ধারণার সমাবেশে ভদ্রলোকের বিকাশ হয়েছিল সমাজে, তার কোন

পরিবর্তন আজও হয়নি। বহুকালের সংস্কারের মতন মনের মধ্যে আজও তার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক হাওয়া-বদল যত তাড়াতাড়ি হয়, সংস্কার-সংস্কৃতির পরিবর্তন তত তাড়াতাড়ি হয় না। মানুষের সমাজে ভদ্রলোকদের তাই রাজনৈতিক বাহ্য পরিবর্তন হয়েছে, মানসিক সংস্কার ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হবে না বা হতে পারে না, এমন কথা সমাজবিজ্ঞানীরা অন্তত বলবেন না। কিন্তু সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আদিপ্রস্তর যুগের 'অসভ্য' মানুষের বহু সংস্কার আজও এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা নিশ্চিন্তে বহন করে চলেছি। সেই হিসেবে ভদ্রলোকের সংস্কার কবে বদলাবে বলা যায় না।

৪

দিজ্জই কান্তা, খাই পুণবন্তা

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কান্তা, খাই পুণবন্তা।

ওগ্রা ভাত, রম্ভার পাত, গাইয়ের ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত—তার সঙ্গে মৌরলা (?) মাছ আর নালতে শাক, কান্তা দিচ্ছে আর পুণ্যবান খাচ্ছে। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' নামে প্রাকৃত ভাষার ছন্দোগ্রন্থে প্রাকৃত-যুগের একটুক্রো ভোজন-চিত্র। বাঙালী মাত্রই চুক্চুক্ করবেন। কারণ গাইক ঘিত্তা বা মোইলি মচ্ছা কোনটাতেই আমাদের লোভ কম নয়। তার ওপর দিজ্জই কান্তার আলাদা আকর্ষণ তো আছেই। গাইক ঘিত্তার এখন পাত্তা পাওয়াই দায়। মোইলি মচ্ছা থাকলেও খুব সাচ্চা লোক ছাড়া কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারবেন না এবং আমাদের মতন লোক ঘেঁষলেই মচ্ছানীর (মেছুনীর) 'কচ্ছা' বা কেচ্ছা শুনে আসতে হবে। আছে কেবল রম্ভাঅ পত্তা। কিন্তু শুধু শুধু রম্ভার পত্তা চেটে সুখ পাওয়া যায় না। ওগ্গর ভত্তা যে লবণসজুত্তা খাবেন

তারও উপায় নেই ('দুগ্ধসজুক্তা' স্বপ্নাতীত), কারণ ভক্তার মধ্যে প্রস্তর-কংকরের (একসেরে আধপোয়া) এমন প্রচণ্ড 'গথা' বা গাঁট্টা, যে ওগ্‌গর ভক্তা স্বর্ণকান্তি কান্তা-প্রদত্ত হলেও আপনি তা গলাধঃকরণ করার আগেই উগ্‌রে ফেলবেন। তাছাড়া, 'দিজ্জই কান্তার' যুগও অস্তাচলে। এখন কান্তারা অফিস-স্কুলের কর্মক্লান্তা এবং উদ্যত-নখদন্তা গদাধর রাঁধুনির যুগ। সুতরাং শোচনা বৃথা, অশোভনও। কান্তাদের সঙ্গে সঙ্গে 'পুণবন্তাদের' যুগও অস্ত যাচ্ছে। ভোজনক্ষেত্রে পাপিষ্ঠ নরাধমদের যুগ আসন্ন।

কথাটা তা নয়। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে কান্তা দিচ্ছে আর পুণ্যবান খাচ্ছে কি-না সেটা বড় কথা নয়। একেবারে উড়িয়ে দেবার মতনও কথা নয় অবশ্য, কারণ কুদর্শন উগ্রমূর্তি কোন কান্তা খেতে দিলে যতটা পরিমাণে খাওয়া যায় এবং খেয়ে যেরকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায় সুদর্শন কমনীয় মূর্তি কান্তার পরিবেশনে এবং দেখা গেছে যে, পরিমাণেও অনেক বেশী খাওয়া যায়। খাওয়ার সঙ্গে দেওয়ারও যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেকথা সহজে ভোলা যায় না। কি করে ভুলব ? বাস্তবক্ষেত্রে দেখেছি, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ নয় শুধু, একেবারে অঙ্গাঙ্গী। সামান্য 'চা'-য়ের কথাই বলি। বন্ধুপত্নী বা বন্ধুভগ্নী মুখ 'বেজার' করে জিজ্ঞাসা করলেন : "চা খাবেন না-কি ?" নাকীসুরে ঐ "খাবেন না-কি" বলার ভঙ্গি দেখেই চা'য়ের তৃষ্ণা আপনার মিটে যাবে, পান করার প্রবৃত্তি হবে না। চা-চাতক হয়েও আপনি বলতে বাধ্য হবেন : "ধন্যবাদ ! এইমাত্র খেয়ে আসছি, আর দরকার নেই।" কিন্তু আকণ্ঠ চা পান করে এসেছেন, একচুমুকও আর পান করতে চান না। এমন অবস্থাতেও মালবিকা দেবী যদি বলেন : "বসুন, একটু চা' করে আনি" এবং "এক্ষুণি আসছি" বলে হাসিমুখে সলজ্জ ভঙ্গিতে যদি উঠে চলে যান, তাহলে আকণ্ঠ পান করা সত্ত্বেও চা'য়ের তৃষ্ণায় আপনার কণ্ঠ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠবে, এক কাপ কেন, আপনি এক পট চা'ও অনায়াসে খেয়ে ফেলবেন। সুতরাং

দেওয়ার সঙ্গে খাওয়ার সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না কিছুতে। শুধু 'দিজ্জই কান্তা' নয়, কি ভঙ্গিতে, কি মূর্তিতে ও মেজাজে 'দির্জ্জই', সেটাও খাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সিরিয়াস্‌লি ভাববার কথা। স্বচক্ষে দেখেছি, কান্তা-বিশেষে আহারের তারতম্য হয়, পরিমাণে ও পরিতৃপ্তিতে। কেন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন, আমি পারব না। মনে হয়, খাদ্যগ্রন্থির ক্ষরণের সঙ্গে কান্তার পরিবেশনের সম্পর্ক আছে। আধুনিক 'গ্যাস্ট্রিক ট্রাবলের' অন্যতম কারণ বোধ হয় কান্তা-স্পর্শশূন্য ভোজন। অনেক সময় খাবার না খেলেও কোন উত্তম খাদ্যের সুগন্ধে, অথবা মুখরোচক কোন খাদ্যের কথা মনে হলেও জিবে জল দেখা যায়। এই জিবের জল লালাগ্রন্থির রস ছাড়া কিছু নয়। তেমনি মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনলে, পরিবেশনকালীন আন্তরিক ভঙ্গিমাদি দেখলে, 'দিজ্জই কান্তার' প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হয় 'পুণবন্তার' দুইদিকের চোয়ালস্থ প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড এবং জিহ্বার 'সাব্‌ম্যাক্সিলারি' ও 'সাব্‌-লিংগুয়াল' গ্ল্যাণ্ডের উপর। তার ফলে এই সব গ্ল্যাণ্ড থেকে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ হতে থাকে এবং কান্তার দেওয়ার গুণে পুণবন্তা অনেক বেশী খেয়ে ফেলেন। ছেলেবেলায় যে কোন কারণেই হোক, ভুট্টা আর খোট্টার উপর আমার বিজাতীয় অনাসক্তি ছিল। তখন বোধ হয় বছর সাত-আট বয়স হবে। একদিন আমার ক্রীড়া-সঙ্গিনী দুটি ভুট্টা এক পয়সায় কিনে এনে একটি আমাকে হাসিমুখে উপহার দিয়েছিল খেতে। জীবনে সেই আমার প্রথম ভুট্টা খাওয়া এবং শেষও। বড় হয়ে প্রাদেশিকতা বর্জন করেছি। কিন্তু আজও সেই ভুট্টার স্বাদ মনে হয় যেন জিবে লেগে রয়েছে। প্রত্যেকটি ভুট্টার দানা তখন মনে হয়েছিল মিছরির দানা। অতিশয়োক্তি নয়, স্বীকারোক্তি। আর এখন? ঘোলাটে জলের অনেক বন্যা বয়ে গেছে জীবনগঙ্গায়, অনেক জোয়ার, অনেক ভাটার জল। তাই এখন মিছরির দানা মনে হয় যেন স্বাদগন্ধরসকসহীন ভুট্টার দানা। তবু কান্তার মিষ্টিকথায় এখনও যে কাঁকর-জর্জরিত নিয়ন্ত্রিত চাল দুমুঠো বেশী খাই না, এমন কথা বলতে

[প]ারি না। 'দিজ্জই কান্তার' মাহাত্ম্য, প্রাকৃত ও বিকৃত, সব [য]ুগেই সত্য।

যে-খাদ্য নিয়ে প্রধানত এই গদ্য-রচনা, সেই খাদ্যের কথা বলি। কারণ খাদ্য খেলে তবে কান্তার গুণগান করা সম্ভবপর। খাদ্য না [থ]াকলে কান্তার একক্রান্তিও মূল্য নেই। খাদ্যপ্রসঙ্গে প্রথমেই মনে [হ]য়ঃ যুগে যুগে সব বদলায়, কিন্তু জিব বদলায় কি? সব বদলালে, জিব বদলাবে না কেন? জিবও বদলায়। সরীসৃপের জিব আর [ম]ানুষের জিব এক নয়। কিন্তু কুকুরের জিবের সঙ্গে আমাদের জিবের [প]ার্থক্য কোথায়? একমাত্র পার্থক্য, আমরা হাঁ করে জিব বার করে [থ]াকি না। একেবারেই যে থাকি না, তা নয়। কেউ কেউ থাকেন, [এ]বং তাঁদের ব্রেন আর কুকুরের ব্রেনে পার্থক্য খুব বেশী নেই। হঠাৎ [দ]েখলে মনে হবে ওরাংওটাং শিম্পাঞ্জী গরিলা বা বনমানুষের সঙ্গে [ম]ানুষের জিবের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, সামান্য আকার ও রঙের [প]ার্থক্য ছাড়া। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জিবও শ্রেষ্ঠ জিব। শুধু জিব [ন]য়, জিব দাঁত সব। আমাদের পূর্বপুরুষদের মতন আজ আর আমাদের [ল]ঙ্গীনোদ্যত ছেদকদন্ত নেই। পেষকদন্তও অনেক ছোট ও ফ্ল্যাট হয়ে [গ]েছে। দাঁতের সঙ্গে চিবুক ও চোয়ালের যোগাযোগ আছে এবং তার [স]ঙ্গে ব্রেনের। সুতরাং যুগে যুগে দাঁতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিবুক [ও] চোয়ালের পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে গোটা মুখমণ্ডলের [র]ূপান্তর ঘটেছে। এ সবই কিন্তু হয়েছে খাদ্যের জন্য। খাদ্য-সংগ্রহ এবং খাদ্য-ভোজন—প্রধানত এই দুই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় আমরা [ব]নমানুষ থেকে মানুষ হয়েছি এবং বর্বর মানুষ থেকে সভ্য মানুষ [হ]য়েছি। পরিবর্তনের ধারাটা এই ঃ

খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা = সামনের দুপায়ের মুক্তি, হাতের জন্ম
খাদ্য সংগ্রহের চিন্তা = মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও রূপান্তর
খাদ্যভোজন = দাঁত চোয়াল ও চিবুকের পরিবর্তন
খাদ্যরন্ধন = ছেদক ও অন্যান্য দাঁতের পরিবর্তন

চর্বণাল্পতা = পেষক ও চোয়ালের পরিবর্তন
চোষণ ও লেহনের অল্পতা = জিবের পরিবর্তন
চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজ্যের রূপান্তর (রন্ধনের ফলে)
= দাঁত ও চোয়ালের পরিবর্তনের ফলে
মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

সুতরাং, আমরা যে প্রধানত ভোজন করেই সভ্যমানুষ হয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি ভোজন না করতাম এবং রন্ধনের ফলে ভোজ্যবস্তুর পরিবর্তন না হত, তাহলে আমাদের সুন্দর মুখের বিকাশ হত না এবং সুন্দর মুখের জয়ও হত না সর্বত্র। কথাটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আরও বিশেষ করে মনে রাখা উচিত। পুরুষের মুখমণ্ডল নিজের পছন্দমত বদলাবার জন্য নয়, ভোজন ও ভোজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য। অবশ্য পুরুষের সুন্দর মুখের জন্য নিছক এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে মেয়েরা বিশেষ 'ডায়েট' প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। অত্যন্ত ভারি চোয়াল ও অগ্রভাগোচ্চত চিবুক যেসব পুরুষের আছে, দেখলেই মনে হয় আদিম পিথিক্যানথ্রোপাসের সহোদর ভাই, তাঁদের জন্য যদি শুধু স্টিম-বয়েল্ড শাকসব্জী ভোজ্যের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে হয়ত ক্রমে ভাল হতে পারে। লেহন ও চোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চর্বণের মাত্রা তাঁদের বিশেষভাবে কমিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে চোয়াল ক্রমে চুপ্‌সে যেতে পারে এবং চিবুকও ক্রমে পশ্চাদপসরণ করে নাসাগ্রের ভার্টিকাল রেখার উপর সরে আসতে পারে। ভারি চোয়াল যেমন কাম্য নয়, দেখলেই চোয়াড় চোয়াড় মনে হয়, তেমনি প্রজেক্‌টিং চিবুকও সুন্দর নয়, দেখলেই কেমন শূয়োর শূয়োর ধারণা হয়। ভারি চোয়াল যাঁদের আছে তাঁদের মাংসভোজন করা উচিত নয়, এমনকি ছোলা-মটরভাজা বা চিনাবাদাম পর্যন্ত নয়, কেবল পল্‌তার ঝোল, শুক্‌তো, আলুসিদ্ধ, শাকসব্জীসিদ্ধ এবং একটু মাখন খাওয়া উচিত। রুগ্ন হলে দুগ্ধপান করা চলতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত কড়াপাকের সন্দেশ সম্ভব হলে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেসব পুরুষের

মেয়েলী ধরনের চেহারা, মুখটা কতকটা মুরগীর ডিমের মতন, কথাবার্তা ভাবভঙ্গি পর্যন্ত মেয়েলী ঢঙের হয়ে গেছে, মাংসই তাঁদের প্রধান ডায়েট হওয়া উচিত। মাংস মানে আধুনিক কায়দায় মাংসের শুক্তো বা 'স্টু' নয়, শিকে ঝল্‌সানো আধকাঁচা মাংস। ছেলেবেলা থেকে যাঁরা খুব বেশী মাত্রায় চুষেছেন ও চেটেছেন এবং চিবিয়েছেন খুব কম, তাঁরাই শেষপর্যন্ত রমণীর রূপ ধারণ করেন। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, মেয়েলি-ধরনের পুরুষরাই বুড়ো-খোকার মতন আঙুল চুষে থাকেন এবং চোষার মতন কিছু একটা দেখলেই চুক্‌-চুক্ করেন। নানারকমের পদার্থ চুষেই শেষপর্যন্ত তাঁদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবনেও তাঁরা কলা চোষেণ। যে সব পুরুষ রমণীতুল্য তাঁদের চোষ্য ভোজ্য একেবারে বর্জন করা উচিত, কান্তা দিলেও খাওয়া (অর্থাৎ চোষা) উচিত নয়। তাঁদের একমাত্র ভোজ্য হওয়া উচিত চর্ব্য পদার্থ, চোষ্য নয়, লেহ্যও নয়। চর্বণসাপেক্ষ খাদ্য যত বেশী তাঁরা খাবেন ততই মঙ্গল। মাংস তো খাবেনই, এবং সম্ভব হলে কচিপাঁঠা ছাড়া আরও অন্যান্য জানোয়ারের মাংস খাওয়া উচিত। মাংসের বদলে হাড় চিবুতে পারলে আরও ভাল হয়। পেষকের রীতিমত ব্যায়াম প্রয়োজন। তাহলে চোয়াল ক্রমশ চওড়া হবে এবং ডিম্বাকৃতি মুখের মধ্যভাগ হরাইজণ্টালি বিস্ফারিত হয়ে লুপ্ত পৌরুষ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। মাংস ভোজনের সামর্থ্য না থাকলে কাঁচা পেয়ারা খাবেন, ঝুনো নারকেল খাবেন, ছোলা-মটরভাজা যতখুশি খাবেন, কিন্তু ভুলেও যেন চুষবেন না। তাহলেই পেষকের দৌলতে আবার পৌরুষ হয়ত ফিরে পেতে পারেন।

খাদ্যের জন্য মুখমণ্ডলের রূপ যদি বদলাতে পারে, তাহলে জিব বদলাবে না কেন ? যুগে যুগে জিবও বদলায়। দেহতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, কতকগুলো পেশী এবং তার উপরে ঝিল্লীর আবরণ দিয়ে মানুষের জিব তৈরি। উপরের এই ঝিল্লীর মধ্যে স্বাদেন্দ্রিয় থাকে। শুধু তাই নয়, কতকগুলি ছোট ছোট স্বাদকোরকও তার মধ্যে থাকে, ইংরেজীতে

'টেস্টবাড' বলে। কোন খাদ্য লালায় লালায়িত হলে এই সব কোরকের স্নায়ুতন্তু স্বাদ-অনুভূতিকে স্বাদকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যায়। তখন আমরা টক-মিষ্টি-কষার আস্বাদবোধ করতে পারি। স্বাদকোরকগুলি জিবের উপর ছড়িয়ে থাকে, তার ফলে জিবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের স্বাদ অনুভূত হয়। জিবের দুইপাশের কোরক দিয়ে টক, পিছনের কোরক দিয়ে তেতো, কটু ও কষা, ডগা দিয়ে মিষ্টি এবং উপর দিয়ে নোন্‌তা আস্বাদ পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রসঙ্গে সামান্য এই জিব-তত্ত্বটুকু (জীবতত্ত্ব নয়) জানা প্রয়োজন, এবং তার জন্য জীব-তত্ত্ববিদ্ হবার প্রয়োজন নেই। জিবতত্ত্বের সারকথা হল এই :

জিবের দুইপাশ = টক
জিবের পিছন = তেতো, কটু ও কষা
জিবের ডগা = মিষ্টি
জিবের উপর = নোন্‌তা

এই জিবতত্ত্বের সঙ্গে পূর্বকথিত দন্ততত্ত্বের মোদ্দাকথাটা মনে রাখলে, একনিমেষে খাদ্যতত্ত্বের মহিমা প্রকট হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের (বিশেষ করে বাঙালীর) আসল বৈকট্য যে কোথায়, তাও সহজে বোধগম্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে খাদ্যসঙ্কট শুধু কি খাদ্যের সঙ্কট, না ভোজনকলাকৈবল্য ?

জিবতত্ত্ব অনুযায়ী যাঁরা বেশি টক খান তাঁদের জিবের দুটি পাশ ট'কে যায়, অর্থাৎ অম্লাস্বাদনে অসাড় হয়ে যায়। যাঁরা তেতো ও কষা জিনিস খান বেশি, অর্থাৎ চিররুগ্ন, তাঁদের জিবের পিছনদিকের কোন সাড় থাকে না। যাঁরা কেবল মিষ্টি খান, তাঁদের জিবের ডগায় কোন মিষ্টতাবোধ থাকে না। ঝাল-নোন্‌তা বেশি খান যাঁরা, তাঁদের জিবের উপরটা উকোর মতন খরখরে হয়ে যায়। জিবতত্ত্বের এই সূত্রটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় : রাঢ়দেশের (বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ইত্যাদি) লোকের জিবের দুপাশের বিশেষ

কোন সাড় নেই, ঝোলে ডালে অম্বলে কেবল টক খেয়ে খেয়ে তাঁদের জিবের দুটি পাশ একেবারে ট'কে গেছে। এই অতিরিক্ত টক খাওয়ার ফলে তাঁদের ভাষার মধ্যেও কেমন যেন টক-টক ভাব এসেছে। অতিথি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কও রাঢ়দেশে মিষ্টিমধুর নয়, অম্লমধুর। অবশ্য সম্পর্কের ব্যাপারে, মিষ্টিমধুর না অম্লমধুর, কোন্‌টির স্বাদ ভাল বলা কঠিন। সুতরাং সে-কথা না তোলাই ভাল। মনে হয় পৌন্ড্রবর্ধনের লোকের মিষ্টিপ্রিয়তা খুব বেশি। নানারকমের মিষ্টান্ন তো আছেই, রান্নাবান্নাতেও মিষ্টির আধিক্য। প্রকৃত বঙ্গদেশীয় যাঁরা তাঁরা ঝাল ও নুন একটু বেশি খান এবং তার ফলে জিবের উপরটা তাঁদের খর্‌খরে হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের অনেক জেলার ভাষাতে পর্যন্ত এই খরজিহ্বার প্রভাব খুব বেশি, যেমন বরিশালের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক বাংলাদেশেই (ভারতবর্ষে তো রীতিমত আছে) ভোজনকলার বিভিন্ন 'কালচার-জোন্‌' আছে এবং প্রত্যেক 'জোনের' লোকের জিবেরও একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ়ের লোকের জিবের দুটি পাশ অসাড় এবং তার টেস্টবাডগুলি বেশ পরি-পুষ্ট। পৌণ্ড্রবর্ধনের লোকের জিবের ডগায় কোন সাড় নেই এবং নেই বলেই বোধ হয় তাদের স্বভাবচরিত্রে মহাপ্রভুভাব খুব বেশি, অর্থাৎ কথায় কথায় লজ্জা পেয়ে তাঁরা জিব বার করে থাকেন। প্রকৃত বঙ্গদেশের জিব বেশ খরখরে, জকার-ধ্বনি ও ঝগড়ার ঝঙ্কারের মধ্যে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ভোজনকলার বিশিষ্টতার জন্য জিবের আঞ্চলিক বিকাশ তো হয়ই, দাঁত ও চোয়ালের বিশেষ ব্যবহারের জন্য মুখমণ্ডলের গড়নের উপরও তার প্রভাব পড়ে। মিষ্টান্ন ফলাহার ঘি দুধ ইত্যাদির পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁদের নধরকান্তি চেহারার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। গায়ের চামড়াটি দুধের সরের মতন তেল-চুক্‌চুকে হয়ে যায়, ভুঁড়িটি হয় নেয়াপাতি ডাবের মতন। মাংসাশী যাঁরা তাঁরা সাধারণত বিস্ফারিত-চিবুক, উন্নত-চোয়াল ও রুক্ষমূর্তি। দেখলেই বোঝা যায়, জানোয়ারের হাড় ও হাড়ের গাঁট-চিবানো মুখ,

দুধ কলা ও ননীর ধার ধারেন না। সুতরাং ভোজন ও ভোজনকলা নগণ্য নয়, বহুদূর বিস্তৃত তার প্রভাব। সামান্য জিবের জন্য একটা জাত পর্যন্ত বদলে যেতে পারে।

ভোজনকলার যে কালচার-জোনের কথা বলেছি, কতকটা তাই নিয়ে কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি ছড়া আছে। ছড়াটি এই :

ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাতাক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।
হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভাল, হরি হরি বোল্।

ছড়াটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না এবং যা পাওয়া যায় তাতে ভোজন-কালচারের আঞ্চলিক বিশেষত্বেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই। মোটামুটি একটা নির্দেশ আছে মাত্র। যেমন, বাঁকুড়ার দই বা বীরভূমের ঘোল যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। ভোলা ময়রার মুখে ঘোল খেয়ে বলছি না, নিজের মুখে আকণ্ঠ খেয়ে বলছি। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, তথা রাঢ়দেশের পোস্ত, কলাই ডাল, মাছের টকের স্বাদ যাঁরা পান নি, তাঁরা রাঢ়ের ভোজনকলা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ বলতে হবে। রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র ঘুরেছি, গ্রামের সাধারণ গরীব গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধনী জমিদারগৃহে পর্যন্ত ভোজন করেছি—সর্বত্রই প্রধান উপকরণ ঐ পোস্ত, কলাই আর মাছের টক্। নিজে পূর্ববঙ্গের লোক, গোড়ার-দিকে বেশ অসুবিধা হয়েছে, অপদস্থও হয়েছি। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহে (বীরভূমে) খেতে বসেছি, যথেষ্ট আয়োজনও তাঁরা করেছেন। পোস্তর একাধিক মেনু শেষ করছি (কলাই ডালসহ) আর মাছের বাটির দিকে তাক্ করে আছি। খণ্ড খণ্ড মাছের টুকরো, গাঢ় গায়েমাখা ঝোল। মাছের

টুক্‌রোর সাইজ আধইঞ্চির বেশি নয়। ভাবছি বিজয় গুপ্তের কথা ঃ "ডুম ডুম করিয়া ছেচিয়া দিল চৈ, ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন-মৎস্যের কৈ।" বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকটা ভাত মেখে নিয়ে মুখে দিতেই জিবটা ট'কে গেল। প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুত হয়ে ভাত সরিয়ে রেখে ঘোল খেয়ে উঠে পড়তে হল। এরকম আর দ্বিতীয়বার হয়নি। জয়দেব-কেঁদুলির মেলায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের গৃহে ভোজনও করেছি, কলাই পোস্তর গল্পও শুনেছি। বৃদ্ধবয়সে তাঁর অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি না থাকলেও, পোস্ত না হলে তাঁর একদিনও চলে না.রুটি লুচির সঙ্গেও পোস্ত প্রয়োজন। খাঁটি রাঢ়ের ভোজন।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেকালের ভোজন ও রন্ধনকলার বিস্তৃত বর্ণনা যেরকম পাওয়া যায় এরকম আর অন্য কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্বেরও অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বিজয় গুপ্ত নানারকম আমিষ নিরামিষ ব্যঞ্জনের বর্ণনা করেছেন, যেমন— "নারিকেল-কোরা দিয়ে রান্ধে মশুরীর সূপ", "কলার থোড় রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই", "সরিষাবাটা দিয়ে রান্ধে পানীকচুর চৈ", "মরিচের ঝাল দিয়ে রান্ধে বটবটী", "শুক্তাপাতা দিয়ে রান্ধে কলাইয়ের ডাল" ইত্যাদি নিরামিষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মাছ মাংসের মধ্যে—"রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ"; "মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ", "ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা, তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙড়ির মাথা", "ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল", "মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল, ছাল খসাইয়া রাঁধে বুড়া খাসীর তেল", "ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম" ইত্যাদি ফরমুলা আধুনিকেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যদি অবসর পান।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম পশ্চিমবঙ্গের লোক। খুল্লনার রান্নার মধ্যে রাঢ়ের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তা সহজে বোঝা যায় না, কারণ নিরামিষ ব্যঞ্জন বাংলাদেশে সর্বত্র প্রায় সমান। তবু দুএকটির কথা উল্লেখ করছি, যেমন—"ঘৃতে ভাজা পলা কড়ি, উনটা শাকে ফুলবড়ি", "দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড'", "মুগস্থপে ইক্ষুরস", ইত্যাদি। মাছের মধ্যে চিতলের কোলভাজা, "মান বড়ি মরিচে ভূষিত" রোহিত মৎস্যের ঝোল আছে এবং তার সঙ্গে "রাঁধিত পাঁকল ঝস দিয়া তেঁতুলের রসও" আছে। বিশেষ যে পার্থক্য আছে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তা মনে হয় না। তার একটা প্রধান কারণ হল, ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে ভোজনকলার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। আমিষভোজী বাঙালীর মধ্যে নিরামিষভোজনের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল এবং প্রচারের ফলে মধ্যবিত্ত ও ধনী বাঙালী সমাজে ভোজনের পরিবর্তনও হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সাধারণ বাঙালী অবশ্য তখনকার মতন এখনও নিরামিষের প্রভাবমুক্ত। তান্ত্রিক ধর্মের পীঠস্থান রাঢ়ের কবিরাও নিরামিষের বৈষ্ণব প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দাসীকে দিয়ে যেভাবে শাক সংগ্রহ করিয়েছেন—

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,
তিক্ত ফলতার শাক কলতা পলতা।
সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা,
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গী ডাঁড়ি পলা।
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে,
মহুরী শূলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেতে।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার আড়া—ইত্যাদি

তাতে মনে হয় তিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বসেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বর্জন করতে পারেন নি। বৃন্দাবন দাস 'শ্রীশাক ব্যঞ্জনে' গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথা উল্লেখ করে শাকের সৌভাগ্য বর্ণনা করছেন।

হেলঞ্চাসালঞ্চায় ভক্তের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির' (আধ্যাত্মিক অর্থে, লৌকিক অর্থে নয়) কথাও তিনি বলেছেন। লৌকিক অর্থে, কেবল শাকব্যঞ্জন ভোজনে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' অবশ্য সব সময় ঘটতে পারে, কিন্তু শাকমাহাত্ম্যের সঙ্গে কৃষ্ণমাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতটা আছে না-আছে তা কেবল শাক-জীবী ও শাকপন্থীরাই বলতে পারেন। একটা কথা অবশ্য মনে হয়। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েরই লীলাভূমি কাটোয়া থেকে বেশী দূর নয়। কাটোয়ার ডাঁটাই কি তাঁদের প্রগাঢ় শাকপ্রীতির কারণ? তাছাড়া কেশব ভারতীও ঐ অঞ্চলের লোক এবং শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে কাটোয়ায় সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনদিন অনাহারে থেকে তিনি গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে যা আহার করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নানারকমের 'বাস্তুক শাক', 'পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি', 'মান কচু', 'কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তকী', 'পটোল ফুল বড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী,' 'মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড', 'মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়', 'মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট' ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরামিষ আহার শেষ হবার পরে খেলেন—'ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট', 'সঘৃত পায়স মৃৎ-কুণ্ডিকা ভরিয়া,' 'তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ' 'দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি, চাঁপাকলা দধি সন্দেশ' ইত্যাদি। শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গৌরচন্দ্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভট্টাচার্য-গৃহিণী সযত্নে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পাক করেছিলেন তা সবই নিরামিষ। তার মধ্যে 'দশবিধ শাক', 'দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী নামরা, মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্তকী' প্রভৃতি সবই আছে। মিষ্টান্ন ও ফলাহারেরও অভাব নেই। এসব কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা। বৃন্দাবন দাসও 'বিংশতি প্রকার শাক, নানা প্রকার শর্করা সন্দেশ' ইত্যাদির কথা বলে অবশেষে লিখেছেন—

ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।

পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের যুগ থেকে বাঙালীর খাদ্যের একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর হতে থাকে। মাছ মাংসাদি আমিষ ব্যঞ্জন থেকে নিরামিষের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশি। শ্রীচৈতন্যের যুগকে আমরা আমিষ-কালচার থেকে নিরামিষ-কালচারে রূপান্তরের যুগ বলতে পারি। নিরামিষ ভোজনের 'করোলারি' রূপে ফলাহার ও মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যও এই সময় দেখা দেয়। শাক মানকচু কুষ্মাণ্ড, এমন কি বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডপ্রীতির সঙ্গে নারকেল সন্দেশ, পুলিপিঠা পায়স ও চিপিটক-কদলকান্নুরাগও বৈষ্ণব গোস্বামীদের গভীর হয়ে ওঠে। "পীত ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপই" তখন রেওয়াজ ছিল, ঘি'য়ে ভাজা লুচির কথা শোনা যায়নি। বৈষ্ণব মহোৎসবই প্রধানত বাঙালীর নিরামিষ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নকে বৈচিত্র্যে ও মনোহারিত্বে চারুকলার স্তরে উন্নত করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের এও একটা উল্লেখযোগ্য দান। মনে হয়, এও যেন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা রূপ। বাংলাদেশ প্রাগার্য সংস্কৃতি-প্রধান দেশ, শক্তি পূজা, তান্ত্রিক আচার ব্যবহার বাঙালী জাতির মজ্জাগত। মাংসই বাংলার দেবদেবীর প্রিয়তম খাদ্য, বাঙালীরও। ইসলামের অভিযানের পর বিশেষ করে, মাংসের প্রাধান্য আরও বাড়তে থাকে এবং রীতিমত মাংস ভোজনের একটা হিড়িক আসে। চৈতন্য চরিত-কাররা সকলেই প্রায় "মদ্য মাংস" ভোজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয়, শুধু হিংসা বা বলিদান নয়, ইসলাম ও তন্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাঙালী বৈষ্ণবরা মিষ্টান্ন, ফলাহার ও নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাসের প্রবর্তন করেছেন। নারকেলের নাড়ু, চিড়ের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, সরের নাড়ু প্রভৃতি নানারকমের নাড়ু তৈরি করে যেন তাঁরা বাংলার জনসাধারণের মন ভুলানোর চেষ্টা করেছেন। বাঙালীর মিষ্টান্নের তাই এত বাহার, এত বৈচিত্র্য! অনুপম শিল্পকলার পর্যায়ে তাই তার চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বাঙালীর নিরামিষ-ব্যঞ্জনও তাই শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর

মধ্যে অদ্বিতীয়। বাংলাদেশে ভোজনকলাকে শিল্পকলার মর্যাদা দিয়েছেন প্রধানত বাঙালী বৈষ্ণবরা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মাছ মাংসের যুগ ছেড়ে আমরা চিপিটক-কদলক ও কচু-কুষ্মাণ্ডের যুগে পদার্পণ করেছি। শাক কচুর প্রভাব যেমন চণ্ডীভক্ত হয়েও মুকুন্দরাম ছাড়তে পারেন নি, তেমনি রাঢ় দেশের 'ধর্মমঙ্গলের' অন্যান্য কবিরাও মিষ্টান্ন বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন নি। ঘনরাম 'উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা, ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা', 'ঘৃতপক্ক লুচি', 'লাড়ু কলা চিনিফেণী', 'মজা মর্তমান মিছরি মনোহরা মতিচুর খাসামৃত' ইত্যাদির কথা বলেছেন। এমন কি, ভারতচন্দ্রের যুগে রীতমত বিলাতী খানা চালু হওয়া সত্ত্বেও "আশিকা পিযুযী পুরী পুলি চুটী রুটী রাম রোট মুগের শ্যামুলী কলাবড়া ঘিওর পাপর ভাজা পুলী", "সুধা রুচি মুচি মুচি লুচির" মরশুম শেষ হয়নি দেখা যায়।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঙালীর ভোজনকলাকে শিল্পকলার স্তরে নিয়ে গেছেন সত্যি, কিন্তু বাঙালী জাতিকে কেবল আর্টিস্টিক খাদ্য খাইয়ে দোতুল দে ও শিহরণ সেনের জাতিতেও পরিণত করেছেন। চিপিটক-কদলকের গুণগান বিদেশী সাহেবরাও করেছেন, খাদ্যগুণও তার অস্বীকার করা যায় না। মিষ্টান্ন যে শুধু মন হরণ করে তা নয়, বলও বৃদ্ধি করে। কিন্তু চিপিটক-কদলকের সঙ্গে যে দই চাই, যে ঘনাবর্ত দুগ্ধ চাই, তা কোথায় পাই? বাকি থাকে নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাস, বিবিধ শাক মোচা, কুষ্মাণ্ড মানকচু বড়ি ইত্যাদি। বৃন্দাবন দাস শাক-কচু-কুষ্মাণ্ডভোজনে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'র কথা বলেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক, লৌকিক অর্থে আমরা যে শাক-কচু-কুষ্মাণ্ডাহারের ফলে জাতিগতভাবে 'কেষ্ট' পাচ্ছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ কুষ্মাণ্ডবিরোধী হলেও, শাক-কচুর বিরোধী নই। পাকা গিন্নীর রান্না হলে ভারতচন্দ্রের 'মুচি মুচি লুচি কতগুলি' ফেলে কচু খেতে হবে, এও স্বীকার করি। কচু কিন্তু কচু ছাড়া কিছু নয়,

কচুর আছে কি ? শাকেই বা কি আছে ? কাটোয়ার কবিরা যতই শাকের গুণগান করুন না কেন, দেহের হাড়ই যদি লিকলিকে কাঠি হয়ে যায়, তাহলে শাক খেয়ে লাভ কি ? কাটোয়ার ডাঁটার তবু একটা ইউটিলিটি আছে, বেশ করে চিবুতে পারলে পেষকদন্তের ক্রিয়ায় চোয়াল ভারি হতে পারে এবং মেয়েলী ধরনের পুরুষের ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলে পৌরুষের ভাব ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু শাক, তা সে যে শাকই হোক, ঘাসেরই সে মাসতুতো ভাই এবং ঘাস খেয়ে দুধ দিতে কোন মানুষই চায় না।

বাঙালী মাত্রই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভালবাসেন এবং ঠাকুমা-পিসিমাদের যুগের নিরামিষ রান্না শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আফশোস করেন। 'কোথায় গেল সেই মোচার ঘণ্ট আর এঁচোড়ের ডানলার যুগ', বলে অনেককে হাহুতাশ করতে দেখেছি। আমার কেবল মনে হয়, কোথায় গেল সেই বাঙালী মেয়েরা যারা—

> কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া,
> তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া ॥
> কৈতরের বাচ্ছা ভাজে, কাউঠার হাতা।
> ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা ॥
> ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত।
> মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত ॥
> রান্ধিছে পাঁঠার মাংস দিয়া খর ঝাল।
> পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ॥

মনে হয় বলে এমন কথা অবশ্য আমি বলিছ না যে তাঁরা যেখানেই যান ফিরে আসুন আবার সেই রান্নাঘরে এবং পাঁঠার মাংস 'খর ঝাল দিয়া' রান্না করে আমাদের খাওয়ান। 'দিজ্জই কান্তা খাই পুণবন্তার' মতন আবার পরম তৃপ্তিতে খাই। না খেতে পেলেও অমন কথা বলব না। তার কারণ রান্নাঘরই মেয়েদের

কারাগার এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানবগোষ্ঠী ঐ রান্নাঘর-কারাগারে ক্রীতদাসের মতন বন্দী হয়ে থেকেছে। অতএব 'ডাউন উইথ রান্নাঘর!' আর 'ডাউন' না বলেই বা উপায় কি? কারণ আধুনিক গৃহিণীরা কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ টেলিফোন গার্ল, কেউ স্টেনোটাইপিস্ট, কেউ কেরানী, কেউ ক্যানভাসার। রান্নাঘরে বসে মোচার ঘণ্ট বা মুদ্গের সূপ রান্নার সময় কোথায় তাঁদের? কিন্তু রান্নাঘর ডাউন করে 'লঙ লিভ পাইস হোটেল' বলতেও আমি রাজি নই, পেটের ওপর দূর্বাঘাস গজিয়ে গেলেও না। তাহলে পুণবন্তাদের খাদ্যটা শেষ পর্যন্ত 'দিজ্জই' কে? যদি বলেন ভৃত্য বা রাঁধুনি বামুন, তাহলে বলব এখনও আপনি সেই 'পুরাতন ভৃত্যের' যুগে বাস করছেন। পুরাতন ভৃত্যের যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। সুতরাং 'দিজ্জই কে' প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। ঘুরে ফিরে 'দিজ্জই কান্তাতে' আসা ছাড়া উপায় নেই, কারণ দিজ্জই হোটেল বা দিজ্জই কেষ্টা, কোনটাই সম্ভব নয়। এটা একটা ট্রানজিশানাল ক্রাইসিস, যুগসন্ধির সঙ্কট! রান্নাঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে যাবার মাঝপথের ভোজনসঙ্কট। অথচ কাজ করে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বাজায় রেখেও কান্তারা দিতে পারেন এবং পুণবন্তারা খেতেও পারেন। সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করে নানারকমের নিরামিষ ও আমিষ ব্যঞ্জন তাঁরা রাঁধতে বসুন, এমন কথা বলছি না। 'ডালভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা' গোছের কিছু একটা হলেই পুণবন্তারা 'ধিন্‌তা-তা-ধিনা' করে নেচে সানন্দে খেতে পারেন।

সুতরাং সঙ্কট শুধু খাদ্যসঙ্কট নয়, 'দিজ্জই কান্তার'ও সঙ্কট। খাদ্য ও কান্তা উভয়সঙ্কটে পড়ে বাঙালী পুণবন্তাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছুকাল পরে তাঁরা শাক আর মুদ্গের সূপ ছাড়া আর কিছু খেয়ে হজমও করতে পারবেন না। অর্থাৎ বাঙালী জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গোস্বামীযুগের শাক-কচু-কুষ্মাণ্ড খেয়ে খেয়ে একে চোয়াল চুপ্‌সে যাচ্ছে, তার উপর কান্তারা কর্মক্লান্তা, দেখবার কেউ নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সত্যিই দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে!

৫

বিবাহের চেয়ে অনেক বড়

আমরা যারা 'সভ্য' মানুষ তারা নিজের জন্মদাতা 'বাবাকে' ছাড়া আর কাউকে 'বাবা' বলে ডাকতে রাজি নই। আধুনিক জামাইরা পর্যন্ত শাশুড়িকে যত সহজে 'মা' বলে ডাকতে পারেন, নিশ্চয়ই তত সহজে শ্বশুরকে 'বাবা' বলতে পারেন না। নিজের বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'বাবা' বলে ডাকা যে কি ভয়ানক কঠিন ব্যাপার তা একটা চলতি প্রবাদ থেকেই বোঝা যায়, "সাধে কি আর 'বাবা' বলি, গুঁতোর চোটে 'বাবা' বলি"। কিন্তু যাদের আমরা 'অসভ্য' বলতে অভ্যস্ত সেই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে 'বাবা' বলাটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এরকম আদিবাসীদের মধ্যে গেলে আমরা আঁতকে উঠবো। মনে করুন, একদল আদিবাসীকে ডেকে একজনকে প্রশ্ন করা হল ঃ "এ তোমার কে হয়?" সে বলল "বাবা"। তারপর তার পাশের ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ একই প্রশ্ন, তাতেও সে জবাব দিলে "বাবা" হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একজন লোকের দশজন বাবা তার সঙ্গেই উপস্থিত, আরও কতজন যে রয়েছে তার ঠিক নেই। এতে আমরা হয়ত দিশেহারা হয়ে যাব, কিন্তু

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। কারণ তাঁরা এই "সম্বোধনের" ভেতর দিয়ে সেই আদিম জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট 'দিশে' পাবেন। এই "আত্মীয়-সম্বোধন", ইংরেজীতে যাকে "kinship terms" বলা হয়, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এটা অনুসন্ধানের মস্ত বড় কৌশল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, 'দিশেটা' তাঁরা কোথায় পেলেন, কি থেকে পেলেন এবং তা থেকে তাঁদের সামাজিক ব্যাপার অনুসন্ধানের সুযোগই বা কোথায়?

এইখানেই "বিয়ের" ব্যাপার আসে। প্রশ্ন ওঠে, গোড়া থেকেই কি মানুষ "একজন স্ত্রীর সঙ্গে একজন পুরুষের আজীবন যৌন সম্পর্কের" অর্থাৎ একবিয়ের, না অনেকবিয়ের, অর্থাৎ স্বাধীন যৌন সম্পর্কের পক্ষপাতী ছিল? সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ আছে, তর্কবিতর্কও হয়েছে প্রচুর। একদল বলেন যে, গোড়াতে স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল, 'অনেক বিয়ের' প্রচলন ছিল। আর একদল বলেন, একবিয়েই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, বহুবিয়ের যে সব নমুনা দেখা যায় তা বিকৃতি মাত্র। দ্বিতীয় দলের (ওয়েস্টারমার্ক এঁদের মধ্যে প্রধান) যুক্তি ক্রমেই নৃবিজ্ঞানীরা বাতিল করে দিচ্ছেন। প্রথম দলের মধ্যে টাইলর, মর্গান, ব্রিফল্ট প্রভৃতি অন্যতম। দ্বিতীয় দলের যুক্তি বাস্তবিকই একেবারে অচল বলে মনে হয়। বিয়ের সম্পর্ক বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বিশেষ করে একবিয়ের ব্যাপার গোড়াতেই মানুষ চিন্তা করেছে, এমন কথা ভাববার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জৈবিক তাগিদটাই গোড়ার কথা এবং বড় কথা বিয়েটা তার অনেক পরের আবিষ্কার। প্রথম যুগে জৈবিক তাগিদে যৌনসম্পর্ক স্বাধীন ও সহজ থাকাই স্বাভাবিক। তারপর বিয়ের প্রয়োজন বা স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের

প্রয়োজন 'সমাজ' গড়ার প্রাথমিক তাগিদ থেকে এসেছে। ওয়েস্টার-মার্ক অবশ্য জৈবিক তাগিদকে বাতিল করার জন্য গরিলাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, গরিলারাও একবিয়েতে সন্তুষ্ট থাকে। ব্রিফল্ট প্রচুর প্রমাণ দিয়ে বলেছেন যে গরিলাদের সম্বন্ধেও এ মন্তব্য ভুল। আজকালকার জুকারম্যান প্রমুখ প্রাণীবিজ্ঞানীরাও গরিলাদের একবিয়ের অনুরাগী বলেন না। যাই হোক, বহুবিয়েটাই যে গোড়ার কথা তা আজকাল অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী স্বীকার করে নিয়েছেন।

এখন দেখা যাক, 'বহুবিয়ে' কত রকমের হতে পারে। মোটামুটি তিন রকমের 'বহু বিয়ে' হতে পারে। একজন স্বামীর অনেক স্ত্রী, একজন স্ত্রীর অনেক স্বামী এবং একদল স্বামীর একদল স্ত্রী। বহুপতিত্ব (Polyandry) ও বহুপত্নীত্ব (Polygyny)-এর মধ্যে কোন্‌টা সমাজে আগে বা পরে এসেছে তা বলা যায় না। সমাজের একই স্তরে, স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতে, দুই প্রথারই প্রচলন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'গোষ্ঠীবিয়ে' (Group-marriage) যে সকলের আগে মানুষের সমাজে প্রচলিত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এইবারে স্বচ্ছন্দে অনেককে "বাবা" বলার ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা অনেককে "বাবা" বলে, তারা কেন বলে? শুধু নিজের জন্মদাতা "বাবা" নয়, গোষ্ঠীর মধ্যে আরও অনেকে যারা "মার" স্বামী হতে পারত, তাদের সকলকেই "বাবা" বলাই তাদের রীতি। তেমনি আরও যারা তার "বাবার" স্ত্রী হতে পারত, তাদের সকলকে তারা "মা" বলে। বাকি সকলে এদেরই ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ "ভাইবোন"। এখনও যে অনেক আদিমজাতির মধ্যে এই 'সম্বোধন' প্রচলিত আছে, এর থেকে নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, একসময় "গোষ্ঠীবিয়ে" সমাজে চলিত ছিল, এগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। যে সমাজে বা যে কৌমের (Tribe) মধ্যে একদল স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্ক স্বাধীন, সেখানে কে "বাবা" জানা কঠিন। সুতরাং পিতৃস্থানীয় সকলেই "বাবা" এবং মাতৃস্থানীয়া সকলেই "মা"

হওয়া সেই অবস্থায় স্বাভাবিক। বাকি সকলে যে 'ভাইবোন' হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমে মানুষের মধ্যে "গোষ্ঠীবিয়ে" ছিল যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে প্রথমে "মাতৃতান্ত্রিক" সমাজ এবং পরে "পিতৃতান্ত্রিক" সমাজের বিকাশ হয়েছে, একথাও স্বীকার করতে হয়। কেন? যেখানে একদল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বচ্ছন্দ যৌনবিহার চলে, সেখানে বাবাকে না চেনা গেলেও মাকে চেনা যাবেই, কারণ 'মা' যে গর্ভ-ধারিণী। মানুষের মধ্যে প্রাথমিক সমাজ গড়ার তাগিদ যখন এল এবং সন্তানদের বংশপরিচয় জানারও দরকার হল, তখন একটা "মূল" বা "কেন্দ্র" না থাকলে চলে না। কাকে এই "মূল কেন্দ্র" করা যায়? "বাবাকে" তো চেনার উপায় নেই, কিন্তু মাকে না চিনে উপায় নেই, তিনি সন্তান গর্ভে ধারণ করছেন, প্রসবও করছেন, পালনও করছেন। অতএব 'মা' হলেন মানুষের প্রথম গড়া সমাজের "মূলকেন্দ্র", তিনিই প্রধান, তিনি অপ্রাকৃতিক শক্তির আধার, রহস্যবৃতা প্রথম "দেবী"। তারপরে "বাবাদের" ইতিহাস শুরু, বাবার আধিপত্য এবং দেবীর বদলে দেবতাদের প্রাধান্যের কাহিনী। সে সব কথা এখন থাক।

তাহলে সমাজবিকাশের ধারায় প্রথমে গোষ্ঠীবিয়ে, তারপর বহুবিয়ে এবং ধীরে ধীরে একবিয়ের দিকে একটা মোটামুটি আঁকাবাঁকা অগ্রগতি দেখা যায়। বহুবিয়ের মধ্যে প্রধানত যে "বহুপতিত্ব" এবং "বহুপত্নীত্ব" দেখা যায়, তার মধ্যে "বহুপতিত্ব"-টাই প্রাচীনতম বলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কারণ অনেককে "বাবা" বলার রীতিটা যদি "গোষ্ঠীবিয়ের" চিহ্ন হয়, তাহলে সেটা "বহুপতিত্বের" চিহ্নও হতে পারে, কারণ এক স্ত্রীর অনেক স্বামী যেখানে, সেখানেও "বাবা" চেনা মুশ্‌কিল। মা-কে কিন্তু সবসময় চেনা যায়। তাই নৃবিজ্ঞানীরা অনেকে নিছক তর্কের খাতিরে না স্বীকার করলেও, মোটামুটি বলা যায় যে, গোষ্ঠীবিয়ের পরে বহুপতিত্ব ও মাতৃতন্ত্রের বিকাশ হয় এবং

বহুপত্নীত্বটা পিতৃতন্ত্রের সমসাময়িক। অবশ্য এ-যুক্তিও খণ্ডন করা যায় না যে, সমাজের একই স্তরের কোন জাতির মধ্যে মেয়ের সংখ্যা অল্প থাকলে সেখানে একস্ত্রীর বহুস্বামী এবং কোথাও পুরুষের সংখ্যা অল্প থাকলে সেখানে একপুরুষের বহুস্ত্রী—এই ধরনের প্রথার প্রচলন এককালেই হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশে এইসব বিয়ের প্রচলন ছিল কি না? ছিল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের দেশটাও দেশ এবং আমাদের দেশের মানুষও মানুষ। আমাদের ভারতবর্ষেও একদিন গোষ্ঠীবিয়ের প্রচলন ছিল, দুইরকমের বহুবিয়েও ছিল, একস্ত্রীর বহুস্বামী এবং একস্বামীর বহুস্ত্রী ছিল। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার ছিল, সেটা হল পিসতুতো-মামাতো ভাইবোনের বিয়ে (Cross-Cousin marriage)। একসময় এই সব বিয়ে যে রীতিমত প্রথা হিসেবে ছিল, তার প্রমাণ আজও আমাদের দেশের মধ্যে রয়েছে, আর প্রাচীনকালে যে ছিল তার প্রমাণ শাস্ত্রসংহিতায় মহাকাব্য পুরাণাদিতে রয়েছে।

একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী, আমাদের দেশে সেই বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। কি করলে সতীনের প্রতি স্বামীর প্রেমে ভাঁটা পড়বে, তার জন্য ঋগ্বেদে পর্যন্ত মন্ত্র রচনা করা হয়েছে। "শতপথ ব্রাহ্মণের" মধ্যে পরিষ্কার চাররকমের স্ত্রীর কথা আছে, যেমন মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী। "মহিষী" হল সর্বশ্রেষ্ঠা, "বাবাতা" হল সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী, "পরিবৃক্তা" হল পরিত্যক্তা স্ত্রী, আর "পালাগলী" হল নীচকুলজাতা স্ত্রী। এতরকমের স্ত্রী-ই যদি থাকে তাহলে কম্-সে-কম্ সেকালের মুনিঋষি ও রাজাদের গড়পড়তা সব রকমের একটি করে থাকলেও তো চারটে স্ত্রী হয়। এ-ছাড়া "মহাভারতে" যে আট রকমের বিয়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে "গান্ধর্ব", "রাক্ষস" ও "পৈশাচ" বিয়েও যখন একরকমের বিয়ে ছিল, তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রেম বলাৎকার ইত্যাদি করতেও

ব্রাহ্মণ মুনিঋষি ও ক্ষত্রিয় রাজাদের বাধত না। বেশি তর্ক না করেই বলা যায় যে, ভীষ্মের কাশীরাজকন্যাহরণ, দুর্যোধনের চিত্রাঙ্গদকন্যাহরণ, অর্জুনের সুভদ্রাহরণ, কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, এ-গুলো "রাক্ষসবিয়ে" হলেও কিড্‌ন্যাপিং ছাড়া আর কি? তাছাড়া ঘুমন্ত কন্যাকে বলাৎকার করে রমণ করাকে "পৈশাচ" বিয়ে বলে সমাজে চালু কবার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং অনেক স্ত্রী থাকাটা আমাদের দেশে সেকালে একটা বাহাদুরির ব্যাপার ছিল। মহাভারত রামায়ণে তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারও বাবার যদি ৩৫০ জন স্ত্রী থাকে, তাহলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্তত গোটা ৩৫ স্ত্রী তো থাকা উচিত। কিন্তু রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা করার উদ্দেশ্যে দশরথের ৩৫০ জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রামকে একস্ত্রীর অনুরক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন মহাকবি। আমাদের দেশের তথাকথিত কৌলিন্যপ্রথার শোচনীয় ইতিহাস যদি স্মরণ করা যায়, তাহলেই দেখা যাবে, আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগেও একপুরুষের কয়েকশত স্ত্রী থাকাটাও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেও বেশ কয়েকজন "বিবাহিতা স্ত্রী" নিয়ে ঘর করেন এমন ভাগ্যবান (?) পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নেই। আর যাঁরা একটার বেশি বিয়ে করতে ভয় পান, তাঁরা যে লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্য নারীর সঙ্গলাভ করেন না এমন নয়, অনেকে তো প্রকাশ্যে "রক্ষিতা" রাখতেও সঙ্কুচিত হন না। একালে পৈশাচ বিয়ে বা রাক্ষসবিয়ে বলে কিছু নেই। তা যদি থাকত তাহলে অলিগলির অনেক "পালাগলী" ও "পরিবৃক্তা" স্বচ্ছন্দে হয়ত "বাবাতা" ও "মহিষীর" স্তরে উঠতে পারতেন।

একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকা যে একসময় আমাদের দেশে অসম্ভব ছিল না এবং অন্যায় বলেও গণ্য হত না, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি আজও পর্যন্ত আমাদের "সভ্য সমাজের" মধ্যে এককালের এই বহুস্বামিত্বপ্রথার স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। হয়ত আমরা তেমন সচেতন নই। সামাজিক শ্লীলতা ও সভ্যতার চেতনার

SENIOR BASIC TRAINING ... BANIPUR

তলায় গুহায়িত-প্রেতের মতন সেই আদিম চেতনাটা লুকিয়ে রয়েছে। একটা রীতির আজও আমাদের সমাজে চলন আছে যেটা সকলেই জানেন। বড়ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ছোটভাইয়ের সম্পর্কটা আমাদের পরিবারে অত্যন্ত মধুর। সম্পর্কটা সবরকমের ঠাট্টা-তামাসা, মধুর রসিকতা ইত্যাদির রসঘন "বৌদি-দেবর" সম্পর্ক। এটা আমাদের শাস্ত্র-সম্মত এবং প্রথানুগত দুই-ই। আমরা অনেকে জানিই না হয়ত যে এই বৌদি-দেবর সম্পর্কটা বহুকালের মৃত বহুস্বামিত্বপ্রথার প্রেতাত্মা মাত্র। "দেবর" কথাটার অর্থই হল "দ্বিতীয় বর"। এর থেকে একটা বিশেষ বিবাহপ্রথার হদিশ পাচ্ছি আমরা। প্রথাটা হচ্ছে, কয়েকজন সহোদর ভাই মিলে একটি স্ত্রী বিবাহ করার প্রথা। নৃবিজ্ঞানীরা এই প্রথাকে "ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রি" বলেছেন। কয়েকভাই মিলে একবৌ বিয়ে করার প্রথা আজও আমাদের প্রতিবেশী তিব্বতীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্যে নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের ভেতর এই প্রথা এখনও চালু আছে। দক্ষিণভারতের নায়ারদের প্রথা ছিল, পরিবারের মধ্যে বড়ভাই যে, তার বিয়ে হবে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে, আর অন্যান্য ভাইরা নায়ারকন্যাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ যৌনবিহার করবে, পুত্রকন্যা যারই হোক না কেন তার পিতা হবে বড়ভাই। এগুলো সবই হল এককালে একবৌ-এর বহুস্বামী থাকার নিদর্শন, তবে স্বামীরা সকলে আপন ভাই হওয়া চাই। মহাভারতের "দ্রৌপদীর" ব্যাপারটা একটা বড় দৃষ্টান্ত। মায়ের আদেশ অলঙ্ঘনীয় এই কথা প্রমাণ করার জন্য মহাকবি যতই অক্ষম চেষ্টা করুন না কেন, আসলে যে তিনি একটা প্রচলিত লোকপ্রথাকে ও সামাজিক রীতিকে অস্বীকার করতে পারেন নি সেইটাই বড় কথা। তা না হলে মহাভারতের নায়ক যাঁরা তাঁদেরই এমন বিয়ে তিনি দিতেন না। এছাড়া বেদব্যাসের দোহাই যুধিষ্ঠির নিজেই তো উড়িয়ে দিয়েছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্যন্ত যখন যুধিষ্ঠিরকে এই বিয়ে থেকে বিরত করতে ব্যস্ত, তখনও যুধিষ্ঠির তাঁর উপদেশ না

শুনে পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে। যুধিষ্ঠির বললেন যে এই প্রথা আগে ছিল এবং প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করলেন জটিলা গৌতমীর কথা, যার সাতজন ঋষি স্বামী ছিল, এবং বারক্ষীর কথা, যার দশজন স্বামী ছিল দশ ভাই।

বহুস্বামিত্বপ্রথা যে একসময় আমাদের দেশে রীতিমত চালু ছিল তা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের "নিয়োগ" বিধি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আপস্তম্ব এই নিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সন্তানের জন্য নিজের স্ত্রীকে কোন অপরিচিতের কাছে অর্পণ না করে, সগোত্র কাউকে নিয়োগ করা উচিত। গৌতম বলেছেন যে, সপিণ্ড, সগোত্র বা সপ্রবর সম্পর্কের মধ্যে কাউকে না পাওয়া গেলে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরের লোককেও 'নিয়োগ' করা চলে, তবে এইভাবে দুটির বেশি সন্তান হওয়া কাম্য নয়। এখানে স্ত্রী হল "ক্ষেত্র", প্রকৃত স্বামী হল "ক্ষেত্রিন্" বা "ক্ষেত্রিক", যাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা হল সে হল "নিয়োগিন্" বা "বীজিন্" (বীজ ছড়ায় যে) এবং এইভাবে যে পুত্র জন্মাল সে হল "ক্ষেত্রজ"। মহাভারতের মধ্যেও "নিয়োগপ্রথার" অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই তো "ক্ষেত্রজ"। কে না জানে যে সত্যবতী নিজে ভীষ্মকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ছোটভাই বিচিত্রবীর্যের বিধবা মহিষীদের গর্ভসঞ্চার করার জন্য? ভীষ্ম করেননি বলেই তো ব্যাসকে ঐ কাজটি করতে হল। পাণ্ডু নিজে কি কুন্তীকে অনুরোধ করেননি, ভাল ব্রাহ্মণ বা তপস্বী নিয়োগ করে পুত্রের জন্ম দিতে? শুধু অনুরোধ নয়, পাণ্ডু বুঝিয়েছিলেন কুন্তীকে যুক্তি দিয়ে যে এইভাবে অন্যকে নিয়োগ করে কুন্তী তিনটে পর্যন্ত সন্তানের স্বচ্ছন্দে জননী হতে পারেন, তাতেও তাঁর সতীত্ব যাবে না। তার বেশি, অর্থাৎ চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে হলে তবে তিনি "স্বৈরিণী" ও "বন্ধকী" হবেন। তাছাড়া পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দের একেবারে নির্মূল করে দিলেন, তখন হাজার হাজার ক্ষত্রিয় বিধবা কেঁদেককিয়ে এসে কেন ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরলেন সন্তানের জন্য?

এসব হল এদেশের বহুস্বামিত্ব-প্রথার নিশ্চিত নিদর্শন। বহু-স্বামিত্ব দু-রকমেরই ছিল। সহোদর ভাইদের মধ্যে স্বামিত্ব সীমাবদ্ধ রাখা এবং অনাত্মীয়দের "temporary" স্বামী হিসেবে নিয়োগ করা। ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রি আজও হিমালয়ের পার্বত্য জাতের মধ্যে, গাড়ওয়ালদের মধ্যে, কুমাওনের রাজপুত ব্রাহ্মণ শূদ্রদের মধ্যে, দক্ষিণ ভারতের নায়ার ও টোডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর আমাদের সমাজের বৌদি-দেবর সম্পর্কের মধ্যে এর রেশটা আজও রয়ে গেছে। ম্যাট্রিয়ার্কাল বা নন্-ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রিও যে ছিল একসময় তাও বেশ বোঝা যায়, ধর্মশাস্ত্রের নিয়োগবিধির মধ্যে তার সুস্পষ্ট আভাস রয়ে গেছে।

এইবার মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিয়ের ব্যাপারটা দেখা যাক। বর্তমান সমাজে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অমান্য করেও এই ধরনের বিয়ে চলছে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মামা-পিসেদের মধ্যে বিক্ষোভও দেখা দিচ্ছে। হিন্দুশাস্ত্রের "সপিণ্ড" সম্পর্কটা টেনে বাড়ালে বিয়ে করার মতন কোন ছেলে বা মেয়ে কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একই দেহ বা পিণ্ডের এক কণা পর্যন্ত যাদের মধ্যে থাকবে তারাই সপিণ্ড সম্পর্কিত। বাবা ও মায়ের দিক থেকে হিসেব করলে আত্মীয়-স্বজনের বিরাট পরিধির মধ্যে কেউ বাদ যাবে না। কথায় বলে, এইভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আত্মীয় সকলেই। তাদের মধ্যে যদি বিয়ে করা না চলে তাহলে বিয়ে করতে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে বা চন্দ্রলোকে যেতে হয়। তাই সপিণ্ড সম্পর্ক নিয়ে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ, এই দুই স্কুলের মতভেদ আছে। তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই এখানে। মোটকথা যাজ্ঞবল্ক্য যা বলতে চান তা হল এই যে, মায়ের দিক থেকে পঞ্চম, বাবার দিক থেকে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড সম্পর্ক থাকে, তারপর থাকে না। বিয়ে-থা তারপরে দেওয়া যেতে পারে। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনেরা দুই-পুরুষের মধ্যেই এসে যাচ্ছে, অতএব ধর্মশাস্ত্রের মতে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু

ধর্মশাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ মানবশাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ নয়। সব দেশেই তা দেখা গেছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই বলা হচ্ছে ঃ "হে ইন্দ্র! তুমি এস, যজ্ঞের ভোজ্য গ্রহণ করো, ভাগ্যবানেরা যেমন মাতুলকন্যা গ্রহণ করে তেমনি।" মহাভারতের রোমান্টিক নায়ক অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই মাতুলকন্যা সুভদ্রা ও রুক্মিণীকে বিয়ে করেছিলেন। কাজটা যদি অত্যন্ত গর্হিত হত তাহলে শ্রেষ্ঠ নায়কদের দিয়ে মহাকবি কখনই তা করাতেন না, বিশেষ করে যখন কোন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা ছিল না। এছাড়া সহদেব বিয়ে করেছিলেন মদ্ররাজকন্যাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে—এবং এরা সকলেই পরিণেতাদের মামাতো-বোন। এই ধরনের বিয়ের ব্যাপারটা যদি এদেশে অত্যন্ত অপরাধের হত তাহলে এতগুলো মামাতোবোনের সঙ্গে পিসতুতো ভাইদের বিয়ে মহাভারতের মধ্যে ঘটে যেতে পারত না। সুতরাং মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিয়ে এদেশে যে রীতিমত চলত তা বেশ বোঝা যায়। বৌধায়ন নিজেই তাঁর "ধর্মসূত্রে" উল্লেখ করে গেছেন যে মামার ও পিসিমার মেয়েদের বিয়ে করাটা দক্ষিণ-ভারতের রীতি। এখনও কর্ণাটক মহীশূর প্রদেশের ব্রাহ্মণদের কোন কোন সম্প্রদায় নিজেদের ভাগনিকে পর্যন্ত বিয়ে করেন। অর্থাৎ মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন তো অনেক ভাল কথা, মামা-ভাগ্‌নি বিয়ে পর্যন্ত এদেশে আজও চলে। চলে অনেক কিছুই, আমরা হয় জানি নে, না হয় জেনেও জানতে চাই না। ধর্মশাস্ত্র আমাদের আজন্ম ধাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখার মতন শক্তি আমাদের নেই। মনুসংহিতার বাইরে আজও আমাদের দেশে যে বিরাট মানবসমাজ রয়েছে তার পরিচয় আমরা জানতে চাই না, জানিও না। চোখে ঠুলি পরে কলুর বলদের মতন মানুষের মধ্যে গিয়ে তাদের সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মুক্তমন আর মুক্তচোখ নিয়ে যদি আজও আমরা আমাদের সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশি, তাহলে

আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি প্রথার অনেক বৃত্তান্ত, তাদের ক্রমবিকাশের অনেক কাহিনী আমরা জানতে পারব। এই কাজই সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সারাজীবনের কাজ।

বিয়ের ব্যাপার নিয়ে স্বল্প-পরিসরের মধ্যে সামান্য যেটুকু এখানে আলোচনা করা হল, তা বাইরে থেকে হাল্‌কা মনে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইসব বিবাহপ্রথার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারলে, আমাদের দেশের সমাজবিকাশের ধারা সম্বন্ধে বিরাট একটা ইতিহাস লেখা যায়, যার মূল্য অনেক তথাকথিত 'ইতিহাসের' চেয়ে হাজারগুণ বেশি। বিয়েটা শুধু বিয়ে নয়, বিয়ের চেয়ে অনেক বড়। বিজ্ঞানীর কাছে বিয়েটা মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গোষ্ঠীবিয়ে, বহুবিয়ে (বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব), মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, যৌথ পরিবার, একবিয়ে ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছবি, বিভিন্ন সংস্কৃতিরও। সমাজে যখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ দেখা দেয়নি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণবিকাশ হয়নি, তখন গোষ্ঠীবিয়ে, বহুপতিত্ব ও মাতৃতন্ত্রের বিকাশ সম্ভবপর। শ্রেণীভেদ, সম্পত্তি ইত্যাদির জটিল প্রশ্নের সঙ্গে পিতৃতন্ত্র, একবিয়ে, সপিণ্ড, সগোত্র ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে। কিভাবে বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে, যুগে যুগে ভারতবর্ষের সমাজের বিকাশ হয়েছে তা অনুসন্ধান করার এইসব উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান। ধর্মশাস্ত্র যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সাধারণের মঙ্গলের চেয়েও নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের দিকে নজর রেখেই যে লিখেছেন, তা যে-কোন শাস্ত্র অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। সুতরাং তার বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করার প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা যায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসের অনেক লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। তার মধ্যে শুধু বিয়ের ব্যাপারটাই আমাদের অনেক কাজে লাগতে পারে, কারণ বিয়ে শুধু বিয়ে নয়, তার চেয়ে আরও অনেক বড়ো জিনিস।

৬

উদাসীন স্বামী

'উদাসীন স্বামী' কে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই মুশ্‌কিল। উদাসীন স্বামী নিয়ে সংসার করা মুশ্‌কিল তো বটেই, তার চেয়ে আরও বেশি মুশ্‌কিল তাঁকে ডিফাইন্ করা। কেন তাই বলছি।

মনে করুন, উদাসীন স্বামী হিসেবে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসারে যে ভদ্রলোকের সুনাম বা দুর্নাম আছে, বাইরের বিশ্ব-সংসারে তিনি হয়ত আদৌ উদাসীন না হতে পারেন। ঘরোয়া উদাসীনতাটা একেবারে 'ঘরোয়া' ব্যাপার বলে ভড়ংও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক যাঁরা, সাংসারিক জীবনে তাঁরাই 'declared' উদাসীন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা অনেকেই হয়ত উদাসীন নন। হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা বসে থাকেন না, অনেক-কিছুর পিছনে অনেক কারণে ছোটাছুটি করে তাঁরা হয়রান হন, সুযোগ-কুযোগ কিছুই পেলে ছাড়েন না, উপরে চড়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের যথেষ্ঠ তীব্র, নিচুতে পড়ে থাকতে চান না। অথচ সংসারের মধ্যে এমন একটা ভাব দেখান তাঁরা, যেন সব সময় কাব্যের প্রেরণা খুঁজছেন তন্ময় হয়ে, অথবা গল্পের প্লট, অথবা বৈজ্ঞানিক কোন problem-এর

সামাধান ! দেখলেই মনে হয় যেন জিনিসপত্রের বাজারদর জানা বা স্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার খোরাক যোগান দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এহেন ব্যক্তিদের কি বলবেন ? উদাসীন ? মোটেই নয়। তা যদি না হয়, অর্থাৎ আসল প্রকৃতির দিক থেকে যদি তাঁরা উদাসীন না হন, তাহলে কেবল স্বামী হিসেবে তাঁরা উদাসীন হবেন কেমন করে ? সাংসারিক জীবনে উদাসীনতাটা তাঁদের একটা 'কামুফ্লাজ'। এই জাতীয় সজ্ঞান-উদাসীনদের tackle করা যে-কোন স্ত্রীর পক্ষে খুবই কঠিন। সম্পূর্ণ জেগে যিনি ঘুমের ভাণ করেন, তাঁর ঘুম কখনও ভাঙানো যায় না। কানের কাছে কাড়ানাকাড়া বাজিয়েও তাঁর উদাসীনতার ঘুম ভাঙানো সম্ভব নয়। অতএব বচসা-বিতণ্ডা বা চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই। তাতে সংসারের অশান্তি বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। একমাত্র tit-এর বদলে tat কৌশল প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। স্বামী যতটা উদাসীন হবেন, স্ত্রী হবেন তার দ্বিগুণ উদাসীন। বিযে-বিযক্ষয় হলেও হতে পারে। ছুই উদাসীনের টানাটানিতে সংসার যখন অচল হয়ে পড়বে, তখন এই সব আত্মসচেতন স্বামীর উদাসীনতার মুখোসও খসে পড়বে। পড়বেই যে এমন কথা বলা যায় না, পড়তে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক স্বামীর জন্য বিশেষ করে যদি কোন স্ত্রী মনে গর্ব বোধ করেন, তাহলেই সমস্যা আরও জটিল হয়ে দেখা দেবে। স্বামীটি যদি কোনরকমে জানতে পারেন (জানতে পারাই স্বাভাবিক) যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে 'তুর্লভ সামগ্রী' মনে করেন, তাহলে আর রেহাই নেই। 'সজ্ঞান-উদাসীন' যিনি তাঁর উদাসীনতা নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত, ভক্ত-ভগবানসুলভ মনোভাব স্বামীর কাছে ব্যক্ত না করা। অন্তরের আবেগ বা উচ্ছ্বাস, সংসারের সচলতার স্বার্থে, কিছুটা অবদমন করাই বাঞ্ছনীয়। একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমাদের এই সমাজে বা পরিবারে একবার যাঁরা ভগবানের

পর্যায়ে উঠে ভক্তবৃন্দের স্তুতির আস্বাদ পান, তাঁদের লোভ ক্রমেই বেড়ে যায়। ষোড়শোপচারে পূজা ছাড়া তাঁরা সন্তুষ্ট হতে চান না। সংসারের সজ্ঞান-উদাসীন স্বামীরাও তাই। এই জাতীয় স্বামী নিয়ে যাঁদের ঘর করতে হয়, তাঁদের সর্বাগ্রে উচিত স্বামীকে 'অমূল্য রতন' মনে না করা। তাই বলে তাঁরা যে স্বামীকে হরিরলুটের বাতাসার মতন সুলভে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু মনে করবেন, তা নয়। স্বামীর সজাগ ভ্যানিটির কথাও ভাবতে হবে। সবচেয়ে ভাল কিছুই মনে না করা—অর্থাৎ স্বামীকে কেবল স্বামীই মনে করা।

স্বামী হিসেবে এই 'সজ্ঞান-উদাসীনরা' প্রায় incorrigible স্তরের। আর একজাতের স্বামী আছেন যাঁরা বাইরে উদাসীন, কিন্তু ঘরে উদাসীন নন। তাঁদের নিয়েও কম মুশ্‌কিলে পড়তে হয় না। চাকরি করেন, অথচ উমেদারি করতে জানেন না; সখ আছে, সামর্থ্য নেই; গুণ আছে, কিন্তু তাই ভাঙিয়ে দু-পয়সা করবার মতন যোগ্যতা নেই; ঘরে তড়পান, বাইরে বোবা হয়ে থাকেন; ভিড় দেখলে ভয় পান, গণ্ডগোল দেখলে দূরে সরে যান। এঁরা কতকটা রবীন্দ্রনাথের সেই "উদাসীনের" মতন:

> উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা,
> সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।
> যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই ছাড়িনাকো
> ভাই, ছাড়িনে
> তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়িনে।
> যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
> বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
> কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
> ভুলেও কখন সহসা তাদের নাড়িনে।

এঁদের নির্জ্ঞান-উদাসীন বা হাফ্-সংসারী বলতে পারেন। বাইরের

সমাজ-জীবনের সঙ্গে যেখানে এতটুকু সাংঘাতের সম্ভাবনা আছে, সেখানেই তাঁরা ডানা গুটিয়ে নীড়ে ফিরে আসেন। সংসারের নীড়টি তাঁদের জীবনের ভাঙা জাহাজের একমাত্র বন্দর। এছাড়া সমাজ-সমুদ্রে তাঁদের দুদণ্ড দাঁড়াবার স্থান নেই কোথাও। কি বলবেন এঁদের? স্বামী হিসেবে এঁরা মোটেই উদাসীন নন; বরং অতি-অনুরাগী। বাইরের উন্মুক্ত আকাশের চেয়ে স্ত্রীর চারফুট-বাই-দুফুট আঁচলটাই তাঁদের জীবনের বড় আশ্রয়। কিন্তু তবু সংসার তাঁদের দিয়ে চলে না। অভিজ্ঞ স্ত্রীরা একথা হয়ত স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই জাতীয় নির্জ্ঞান-উদাসীন হাফ্-সংসারী স্বামীর চেয়ে পূর্ণ-বৈরাগী অনেক ভাল।

এই সজ্ঞান-ও-নির্জ্ঞান-উদাসীন স্বামী ছাড়া আরও একজাতের স্বামী আছেন যাঁদের 'অজ্ঞান-উদাসীন' বলা যায়। এই অজ্ঞান-উদাসীনরাই জাত-উদাসীন স্বামী। সজ্ঞান-উদাসীন যাঁরা, উদাসীনতাটা তাঁদের ছদ্মবেশ। নির্জ্ঞান-উদাসীন যাঁরা, উদাসীনতাটা তাঁদের আত্মরক্ষার বর্মবিশেষ। তাঁরা হয়ত স্টিভেনসনের মতন মনে করেন—once you are married, there is nothing left for you, not even suicide, but to be good। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ঘরে too good, বাইরে অপদার্থ ও উদাসীন। আসলে ঘরে-বাইরে কোথাও তাঁদের কোন পদার্থই নেই। তা যদি থাকত, তাহলে পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তাঁরা রক্ষা করে চলতে পারতেন। অজ্ঞান-উদাসীনরা তা নন। উদাসীনতাটা তাঁদের ছদ্মবেশও নয়, বর্মও নয়। যাঁদের সত্যিই সমাজ বা সংসার সম্বন্ধে একেবারেই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তাঁরাই অজ্ঞান-উদাসীন বা আসল উদাসীন স্বামী। তাঁরা ভোলানাথ মহাদেবের সগোত্র। তাঁদের চিনতে কোন স্ত্রীরই কষ্ট হয় না। হয়ত তাঁদের নিয়ে সংসার করা চলে না। সমাজ সংসার পরিবার কোথাও তাঁরা খাপ্ খান না। মনে হয় অরণ্য থেকে যেন তাঁরা নির্বাসিত হয়ে এসেছেন সংসারে, প্রকৃতির

অভিশাপে। তবু তাঁরা দুর্বোধ্য নন। ঘরে বা বাইরে কোথাও তাঁদের চরিত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁদের বোঝা যায়। আর ঘর যে তাঁদের নিয়ে একেবারেই করা যায় না তা নয়। ইচ্ছা করলেই করা যেতে পারে। তবে এই ভোলানাথের মতন কাণ্ড-জ্ঞানহীন জাত-উদাসীন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে হলে, হিমালয়দুহিতা পার্বতীর মতন শক্তির প্রতিমূর্তি ঘরণী হওয়া চাই।

তবু বর্তমান যুগে ও সমাজে এই ভোলানাথশ্রেণীর স্বামী নিয়ে ঘর করা সত্যিই খুব মুশকিল। পদে পদে তাঁকে নিয়ে বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। একথা স্বজাতিবিরুদ্ধ হলেও, স্বীকার করতে আপত্তি নেই। পার্বতীর যুগ যে এটা নয় এবং হরপার্বতীর মিলনও যে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের যুগে সম্ভব নয়, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। সমাজটাও কৈলাসধাম নয়। কমার্স ও ক্যালকুলাস-সর্বস্ব সমাজে কৈলাসের পরিবেশ কোথায়? হরেরা তাই এযুগের hopeless ক্রীচার। চেইন-স্টোর ও ডিপার্টমেন্ট-স্টোরের যুগের গৌরীরা তা বিলক্ষণ জানেন। যেমন ধরুন, এযুগের গৌরীদের সঙ্গে স্টোরে যেতে হবে, বিভাগ থেকে বিভাগান্তরে তাঁর অনুগামী হয়ে ঘুরতে হবে, প্রাইস ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁর শপিং সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা চলবে না। তা না করে যদি ভোলানাথ স্বামী এক-গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে আপন মনে ববম্-ববম্-ব্যোম করতে করতে বেরিয়ে যান এবং বাইরে ফুটপাথে এককোণে পুরানো বইয়ের স্তূপ থেকে একখানা প্লেটোর জীর্ণ works নিয়ে দেখতে থাকেন—তাঁকে খুঁজে বার করতে যদি গৌরী দেবীর গলদঘর্ম হতে হয়, তাহলে শপিং-এর 'শো' বা 'থ্রিল' কিছুই থাকে কি? কোন টি-পার্টিতে গিয়ে ভোলানাথ স্বামী যদি উস্‌খুস্ করেন এবং সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকেন, স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে freely আলাপ করতে না পারেন, হাত-পা নেড়ে আনমনে টি-পট্‌টি টেব্‌ল থেকে ফেলে ভেঙে ফেলেন, তাহলে তাঁকে চায়ের আসর থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে

গিয়ে খাঁচায় বন্দী করতে ইচ্ছা করে না কি? সিন্‌থেটিক সিল্কের শাড়ির পাশে ভোলানাথ স্বামী যদি মোটা চটের মতন খদ্দরের জামাকাপড় পরে, ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে দিয়ে চলতে থাকেন, তাহলে কার না মনে হয় যে দুরন্তগতি কমেটের পাশে যেন ছ্যাকরা গাড়ি চলেছে? তাতে সম্ভ্রমশালীনতাই বা রক্ষা করা যায় কি করে? নতুন hit ফিল্ম এসেছে শহরে, পরিচিত ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কোন মিসেস্ নেই যিনি তাঁর মিস্টারের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসেননি। অথচ এই ভদ্রলোক—মানে ঐ উদাসীন স্বামীটি যদি তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে thesis লিখতে বসেন এবং সেদিকে কোন নজর না দেন, তাহলেই বা কি করে চলে বলুন? খবরের কাগজ পড়ুন না-পড়ুন, নতুন নতুন ফিল্ম না দেখলে 'ব্যাক্‌ডেটেড' হয়ে যাবেন। Cold Cream কিনতে গিয়ে উদাসীন স্বামী যদি ভুলে 'গাওয়া ঘি' কিনে আনেন, এবং শাড়ি কিনতে দিলে বই, তাহলে এই দুর্দিনে সেই ভুলের খেসারৎ দেয় কে বলুন তো?

মুশ্‌কিল বৈ কি! ভোলানাথ-গোছের উদাসীন স্বামী নিয়ে ঘর করবার মতন মুশ্‌কিল এযুগে আর কিছু নেই। একথা একশবার সত্য। বেগের যুগে বোনাফাইড্ উদাসীনতার কোন মূল্য নেই। স্বামীর ক্ষেত্রে তো নেই-ই। এমন কি, তার কোন কাব্যিক মাধুর্যও নেই। ফ্যাশানের বেগ, স্টাইলের বেগ, আদবকায়দার বেগ, সংসারে প্রয়োজনীয়তার বেগ, ভদ্রতার paraphernalia বা সাজসরঞ্জামের বেগ, বাজারের তেজীমন্দার বেগ ইত্যাদি যাবতীয় বেগের সঙ্গে যিনি সমান তালে তাল রেখে চলতে না পারবেন বা চলার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করবেন, তিনিই এযুগের উদাসীন স্বামী। উদাসীন স্বামীর এই হল মডার্ন ডেফিনিশন্। করিৎকর্মা সর্বগুণসম্পন্না সচলা ও বেগবতী স্ত্রীর কাছে তিনি এমনই একটি মহা-মুশ্‌কিলের প্রতিমূর্তি-বিশেষ, যার কোন 'আসান' নেই। Curio-র মতন তিনি কৌতূহল জাগান বটে, কিন্তু কোন কাজে লাগেন না।

৭

মামা ও ভাগ্‌নে

এ-লেখার শিরোনাম দেখে অনেকে হয়ত শিউরে উঠবেন, ভাববেন যে মামা-ভাগ্‌নে নিয়ে আলোচনা আবার কি বস্তু? কেউ হয়ত মনে করবেন যে হাস্যরস পরিবেশন করাই এ রচনার উদ্দেশ্য। গোড়াতেই বলছি, ব্যাপারটা মোটেই লঘু নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের একটা প্রাচীন অধ্যায়ের আলোচনা বললেও ভুল হবে না। আজকের সমাজে ভাগনেদের সঙ্গে মামাদের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, চিরকালই যে তা ছিল এমন কথা বলা যায় না। আমাদের সমাজে মামা-ভাগ্‌নের সম্পর্কটা পারিবারিক গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর সমাজে রীতিমত ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্কে এসে পৌঁছেচে। 'মামা' সম্বোধনটা 'পিতার শ্যালক' হিসেবে গালাগাল-বিশেষ বললেও মিথ্যা বলা হয় না। 'মামা' চিরদিনই তাই ছিলেন, কিন্তু এমন বিদ্রূপের পাত্র তিনি চিরদিন ছিলেন না।

'মামা-ভাগ্‌নের সভ্যতাকে' ইতিহাসের একটা বিশেষ স্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। সেইভাবে বিচার করলে আধুনিক সভ্যতাকে 'পিতা-

পুত্রের সভ্যতা” বলা যায়। একদিকে পিতা-পুত্র, খুড়ো-ভাইপোর সভ্যতা, আর একদিকে মামা-ভাগ্নের সভ্যতা, এই হল সেই আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার ছুটো যুগান্তকারী স্তর। পুত্রটিকে যদি ‘কেন্দ্র’ ধরা যায়, তাহলে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন ‘মামা’ আর একদিকে ‘বাবা’। সভ্যতার একটা বাঁকের মাথায় ‘পুত্রের’ হাত ধরে একদিকে মামা টানছেন, ভাগ্নের উপর তাঁর কর্তৃত্ব তিনি ছাড়তে রাজি নন ; আর একদিকে বাবা টানছেন তাঁর ঔরসজাত বংশধর পুত্রকে। মামা হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, বাবা তাঁর পুত্রের হাত ধরে এগিয়ে চললেন। সভ্যতার নতুন অভিযান শুরু হল। বাবা জয়ী হলেন, মামা বিদায় নিলেন। মামার যুগ অস্তাচলে গেল, আর বাবা-খুড়োর নতুন যুগের সেই উষাকাল থেকে আজ অপরাহ্নে পৌঁছেচি আমরা।

যাঁরা পাহাড় অঞ্চলে গেছেন বা থাকেন তাঁরাই মানুষের সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন। দার্জিলিঙের জলা-পাহাড়ের মাথায় উঠে নিচের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল আঁকা-বাঁকা-ঢালু পথ আর এখানে-ওখানে গাছপালা, টুক্‌রো টুক্‌রো বসতির গুচ্ছ দেখা যায়। দার্জিলিঙ জেলখানা অথবা হ্যাপি ভ্যালির চা-বাগানের কুলিবস্তি থেকে যদি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছে ভাবা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আজ পর্যন্ত আমরা অনেক মেহনত করে জলা-পাহাড় বা ‘টাইগার হিলের’ মাথায় উঠেছি। ওঠার পালা শেষ হয়ে গেছে যে তা নয়। এখনও সভ্যতা-হিমালয়ের অনেক উঁচু শিখর পার হতে হবে মানুষকে, অনেক নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে আনন্দে অবাক্ হয়ে দাঁড়াতে হবে। সভ্যতার কাঞ্চনজঙ্ঘা তো আছেই, এভারেস্টও আছে, হয়ত তার পরেও কিছু আছে। পৃথিবীর বিশাল মানবগোষ্ঠীর একাংশ কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছেচে, বাকি আমরা যারা পৌঁছবার চেষ্টা করছি তারা শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মতন তার তরঙ্গায়িত তুষারশৃঙ্গে নতুন সূর্যোদয় দেখছি।

মামার কথা বলি। মামা আমাদের দার্জিলিঙ বাজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। হ্যাপি ভ্যালির কুলিবস্তি থেকে বাজার পর্যন্ত আমরা মামার হাত ধরে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছি, আর বাজার থেকে জলা-পাহাড়ে পৌঁছেচি বাবা খুড়োর হাত ধরে। মামা শুধু একা বিদায় নিলেন না। তাঁর সঙ্গে সমাজের একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ সংস্থান বা গঠনও বিদায় নিল। সব চেয়ে বড় কথা হল, মামার সঙ্গে মা-ও বিদায় নিলেন। সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ থেকে মা ও মামার এই বিদায় নেওয়ার ব্যাপার একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

মা'র সঙ্গে মামার সম্পর্ক ভাই-বোনের সম্পর্ক। মার সামাজিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মামা প্রয়োগ করেন। মাতৃ-প্রধান সমাজে এই বৈশিষ্ট্যই বেশি দেখা যায়। মা নিজে অথবা মাসিমারা প্রত্যক্ষ-ভাবে শাসন করছেন, এ রকম নিদর্শন পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীরা সামান্যই খুঁজে পেয়েছেন। উত্তর আমেরিকার দু-একটা আদিম জাতির মধ্যে মাতৃজাতির প্রত্যক্ষ সামাজিক শাসন-কর্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ইরোকুয়ারা প্রধান। কিন্তু অধিকাংশ আদিম জাতির মাতৃপ্রধান সমাজে মাতুল-প্রাধান্যই দেখা যায়, অর্থাৎ মা-মাসিদের বদলে মামারা কর্তৃত্ব করেন। এই যে "মাতুল-কর্তৃত্ব" প্রথা, একে নৃবিজ্ঞানীরা "এভানকুলেট" (Avun-culate) বলেন। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মাতৃপ্রধান সমাজ আর মাতুল-কর্তৃত্ব হল সভ্যতার একই স্তরের বিশিষ্টতা। এর ব্যতিক্রম যে আদিম সমাজে দেখা যায় না তা নয়। পিতৃপ্রধান সমাজে আজও কোন-কোন ক্ষেত্রে মাতুলপ্রাধান্য দেখা যায়। যেমন টোরেস স্ট্রেটস দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সমাজ পিতৃপ্রধান, কিন্তু সেখানে প্রাধান্য বা অধিকার পিতার চেয়ে আজও মামারই বেশি। আফ্রিকার আদিম জাতির মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের পিতৃপ্রধান সমাজে মামা একেবারে সর্বময় কর্তা। এই দৃষ্টান্তগুলি বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ডক্টর রিভার্স উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই সব

আদিম জাতি যে পূর্বেকার মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজে পৌঁছেচে, এই প্রথা তারই চিহ্নস্বরূপ আজও রয়েছে। ডক্টর লাউই এ-সম্বন্ধে ক্রো ও হিদৎস্তা জাতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরা মাতৃপ্রধান হলেও মাতুলপ্রাধান্য এদের মধ্যে দেখা যায় না। না দেখা গেলেও রিভার্সের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। এ-সব ব্যতিক্রম হল মাতৃপ্রধান ও পিতৃপ্রধান সমাজের যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রমাণ। সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম হিসেবে আজ একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে মাতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতুলকর্তৃত্ব এবং পিতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পিতৃকর্তৃত্ব বা পিতৃব্যকর্তৃত্ব। পিতৃপ্রাধান্য যে মাতৃপ্রাধান্যের পরবর্তী নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর এমন কথা আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা কেউ হলপ করে বলেন না। লাউই এরকম ধারাবাহিকতা বা স্তরভেদ অস্বীকার করেন। রিভার্সও অবশ্য এরকম স্তরভেদ পুরোপুরি গ্রাহ্য বলে মনে করেন না, কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তিনি এই পর্যন্ত স্বীকার করেন যে প্রাথমিক সামাজিক স্তর হিসেবে মাতৃপ্রাধান্যের দাবি যুক্তিসহ বেশি। বাকোফেন, মর্গান, টাইলর থেকে শুরু করে এযুগের ব্রিফল্ট, হার্টল্যাণ্ড, কতকটা রিভার্স পর্যন্ত মাতৃপ্রধান সমাজকেই মানুষের আদি গোষ্ঠীসমাজ বলে স্বীকার করেছেন।

সুতরাং আমরা যদি বলি যে, মামা-ভাগনের সভ্যতাই মানুষের আদিসভ্যতার একটা রূপ, তাহলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। সভ্যতার নাট্যমঞ্চে "মামা" একদিন যে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে কোন ভুল নেই। তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম নায়ক। মানুষের সমাজে মামার এই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা করেছেন। আধুনিক যুগে যাঁরা এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের

মধ্যে রিভার্সের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আরও চমৎকার ব্যাপার হল এই যে, বাল্যকাল থেকে রিভার্স নিজে তাঁর মামা ডক্টর জেম্‌স হাণ্টের কাছে মানুষ হয়েছেন, এমন কি নৃবিজ্ঞানে তাঁর হাতেখড়িও হয়েছে তাঁর এই মামার কাছে। জেম্‌স হাণ্ট বিলেতের "এ্যান্‌থ্‌রোপোলজিক্যাল্ সোসাইটির" প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট। মামা নিজে সে-যুগের একজন অন্যতম নৃবিজ্ঞানী হয়ে ভাগ্‌নেকেও নৃবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করেন। রিভার্সের কিন্তু খুব বেশি এদিকে ঝোঁক ছিল না, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানই তাঁর সাধনার বিষয় ছিল। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ভিতর দিয়ে তিনি নৃবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হন এবং ১৮৯৮ সালে হ্যাডনের অনুরোধে টোরেস স্ট্রেট্‌স্‌-এ কেম্ব্রিজ এ্যান্‌থ্‌রোপোলজিক্যাল অভিযানে যোগদান করেন। তারপর তিনি আরও অন্যান্য জায়গায় তাঁর গবেষণার কাজের জন্য যান, আমাদের ভারতবর্ষেও তিনি আসেন, দক্ষিণ-ভারতের টোডাদের মধ্যে থেকে তাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। ভারতবর্ষের আদিম সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিভার্সের গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের দেশের মাতৃপ্রধান সমাজ, মাতুল-প্রাধান্য, মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয় বিবাহ, সগোত্র ও স্বজন-বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে রিভার্সের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলনে আমাদের অন্যতম অবলম্বন বললেও ভুল হয় না।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানে রিভার্স এক নতুন অনুসন্ধান-রীতির প্রবর্তক। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, রিভার্স বলেন, মানুষের স্বজন-সম্বোধন, স্বজন-ব্যবহার ইত্যাদির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। প্রত্নবিদের অনুসন্ধানের উপায় যেমন মানুষের উৎপাদনের হাতিয়ার, ভূবিদ ও জীবাশ্মবিদের যেমন পাথর ও ফসিল, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর তেমনি অনুসন্ধানের অন্যতম হাতিয়ার হল এই সব লুপ্ত ও বিলীয়মান স্বজন-রীতিনীতি (Kinship Usages)।

বাবা, মামা, খুড়ো, ভাই-বোন ইত্যাদি স্বজন-সম্বোধনগুলি শুধু কথার কথা নয়, প্রত্যেক সম্বোধনের একটা ইতিহাস আছে, এবং প্রত্যেক সম্বোধনের সঙ্গে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন-ভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি পালনের একটা বাধ্য-বাধকতা। একথা আগের একটি রচনায় বলেছি। সুতরাং এই কথাগুলোও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে অনেকটা জীবাশ্মবিদের ফসিলের মতন। সেগুলি অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করলে তিনি যাদের মধ্যে সেগুলি প্রচলিত তাদের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারেন। রিভার্সের আগে মর্গান, টাইলর এবং আরও অনেকে এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রিভার্সই সর্বপ্রথম এই অনুসন্ধান-রীতির ধারাবাহিক অনুশীলন করেছেন, আদিম মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ গবেষণায়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, কারণ এর এত দিক আছে এবং তার প্রত্যেকটি দিক যে-কোন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে এত বেশী আকর্ষণীয় যে, তার মধ্যে ডুবে যেতে হয়। আমি এখানে কেবল ঐ মামা-ভাগ্‌নের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলব। স্বজন-রীতিনীতি অনুশীলনে রিভার্স কুল-বিচারপদ্ধতির (Genaeological Method) সমর্থক। সেই পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে মামা-ভাগ্‌নের সভ্যতার বিশিষ্ট-তার বিচার করা যাক।

আমাদের সমাজের কথা বলি। আমাদের মধ্যে বাবা, কাকা, জ্যাঠা, দাদা-মশাই, ঠাকুরদা, দিদিমা, ঠাকুমা, দাদা, দিদি, মামা, মামিমা, মাসিমা, পিসিমা, পিসে-মশাই, মা ইত্যাদি যে-সব আত্মীয় সম্বোধন আছে সেগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই প্রধান, তাই প্রায় প্রত্যেক আত্মীয়ের একটা বিশেষ ডাক-নাম আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা এগুলো প্রয়োগ করি। আর 'মা' বলে আমরা সামাজিক

ক্ষেত্রে যে-কোন মাতৃতুল্য মহিলাকে ডাকতে দ্বিধা করি না, কিন্তু পিতৃতুল্য কোন পুরুষকে আমরা হয় কাকাবাবু, না হয় জ্যাঠামশাই বা মেসোমশাই বলি, কিন্তু ভুলেও 'বাবা' বলে ডাকি না, এমন কি শ্বশুরকেও না। পুত্রবধূরা প্রাণের ভয়ে শ্বশুরকে 'বাবা' বলে ডাকেন। এর থেকে বোঝা যায়, 'বাবা' ডাকের মধ্যে আমরা একটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এবং তার মধ্যে একটা বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব ও সম্পর্ক নিহিত আছে, যেমন বংশ-পরিচয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। এ-সব পিতৃপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য। আমাদের সমাজ পিতৃপ্রধান ও ব্যক্তিসর্বস্ব। তাই এত রকমের সম্বোধন, আর 'বাবার' এত গুরুত্ব, এত স্বকীয়তা। কিন্তু তাহলেও আমরা যে আগেকার বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এই সমাজে এসেছি তারও চিহ্ন আজও আছে। তার পরিচয়, নৃবিজ্ঞানীরা যাকে সামাজিক বর্জন-প্রথা (Customs of Avoidances) এবং ঘনিষ্ঠতা-প্রথা (Privileged Familiarity) বলেন, তার ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। ঠাকুমা-ঠাকুরদা ও নাতিনাতনীদের সম্পর্ক আমাদের দেশে রস-মধুর সম্পর্ক, 'বিয়ে' করবি বলে তাঁদের আদর করতেও শোনা যায়। যদি বলি, একসময় অতি প্রাচীনকালে এ-রকম বিবাহপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল তাহলে অনেকে হয়ত আঁতকে উঠবেন। নিউ হেব্রিডিসের পেন্টিকস্ট দ্বীপে আজও এই বিবাহপ্রথার প্রচলন আছে—ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে নাতিনাতনীর বিয়ে। আরও রস-মধুর সম্পর্ক আমাদের সমাজে আছে যেমন—বৌদি-দেবর, জামাইবাবু-শালী ইত্যাদি। নিজের ভাইয়ের বিধবা 'বৌকে' বিয়ে করার রীতিকে (সাধারণত ছোটভাই বড়ভাইয়ের বৌকে) নৃবিজ্ঞানীরা "লেভিরেট" (Levirate) বলেন এবং নিজের স্ত্রীর সহোদরাকে বিয়ে করার রীতিকে (সাধারণত স্ত্রীর ছোট বোনকে) "সোরোরেট" (Sororate) বলেন। আমাদের রসিকতার সম্পর্ক থেকে বোঝা যায়, একসময় আমাদের দেশে লেভিরেট ও সোরোরেট, দুই বিবাহ-প্রথাই প্রচলিত

ছিল। ঠিক তেমনি দেখা যায়, যৌবনকালে সহোদর ভাই-বোন এবং খুড়তুতো-জেড়তুতো ভাই-বোনের মধ্যে যাবতীয় সহজ সরল সম্পর্ক আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ বা "ট্যাবু"। সাধারণত সম্ভবপর যৌবন-সম্পর্কের মধ্যে (Potential Mates) পরবর্তীকালে এ-রকম ট্যাবু আরোপিত হতে পারে বলে নৃবিজ্ঞানীরা এই নিষেধ-প্রথা-গুলিকে আগেকার সমাজের প্রচলিত যৌন সম্পর্কের স্মৃতি-নিদর্শন বলে মনে করেন। সুতরাং ভাই-বোন ও "প্যারালাল কাজিনের" মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রাচীন সমাজে ছিল যে তা এর থেকে আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া, নিজের ও খুড়তুতো-জেড়তুতো ভাই-বোন সম্পর্কে আমাদের এই নিষেধবিধি যতটা কড়া, "ক্রস্‌-কাজিন" বা মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন সম্পর্কে ততটা নয়। এমন কি ভয় বা নিষেধের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, নিজের ভাই-বোনের চেয়ে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের স্বচ্ছন্দ মেলামেশায় ভয়টা হাজারগুণ বেশি। সুতরাং এই বিবাহপ্রথা দীর্ঘদিন সামাজিক রীতি হিসেবে যে এদেশে চালু ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি শুধু এখানে আমাদের "সভ্য" পরিবারের স্বজন-সম্পর্ক নিয়ে বিচার করলাম। প্রকৃতপক্ষে এই সব বিবাহ-প্রথার অধিকাংশই যে আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন ও আদিমযুগে প্রচলিত ছিল তা আজও এ-দেশের আদিম অধিবাসীদের সমাজপ্রথা থেকেই বোঝা যায়।

আমাদের আধুনিক পরিবারের মতন এত বিচিত্র স্বজন-সম্বোধন কিন্তু প্রাচীন বা আদিম মানব-সমাজে পাওয়া যায় না। সমাজের আদিস্তরের দিকে ধাপে-ধাপে যত নেমে যাওয়া যায় ততই দেখা যায়, স্বজন-সম্বোধনের "শব্দগুলি" ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। স্বজন-সম্বোধনের একটা বিশেষ রীতি আদিম মানব-সমাজের ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রীতিকে নৃবিজ্ঞানীরা "গোষ্ঠী-বিভক্ত রীতি" (Classificatory System) বলেছেন, আর আমাদের আধুনিক রীতিকে রিভার্স "পারিবারিক রীতি" (Family

System) বলেছেন। আদিম সমাজের এই "গোষ্ঠী-বিভক্ত রীতি"র বৈশিষ্ট্য কি? মা, বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদি কয়েকটি গোষ্ঠীতে সকলে বিভক্ত। একই 'মা' সম্বোধন, একই 'বাবা' সম্বোধন, একই 'ভাই' বা 'বোন' সম্বোধন শুধু পরিবারের মধ্যে নয়, গোটা ক্ল্যান্ বা সিব্-এর অন্তর্ভুক্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন—

বাবা জ্যাঠারা কাকারা মামারা মেসোমশাইরা পিসেমশাইরা শ্বশুর	সকলেই "বাবা"
মা মাসিমারা মামিমারা কাকীমারা পিসিমারা জ্যেঠিমারা শাশুড়ি	সকলেই "মা"
সহোদর খুড়তুতো-জেড়তুতো ভাইবোন মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন মাসতুতো ভাইবোন শালা-শালী স্বামীর ছোট ভাই-বোন	সকলেই "ভাই ও বোন"

এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করে স্বজন-সম্পর্ক ও স্বজন-সম্বোধন

আদিম মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় দেখা যায়। সাধারণভাবে এইটাই আদিম মানব-সমাজের স্বজন-সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার ডেকোটা জাতির মধ্যে প্রচলিত বলে লাউই একে "ডেকোটা কিন্‌শিপ" বলেছেন, কিন্তু "ক্লাসিফিকেটরী কিন্‌শিপ" একে নৃবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়। এই পথ ধরে মামা-ভাগ্নের সভ্যতার বিশ্লেষণ করা যাক।

রিভার্স মেলানেসীর দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, সেখানকার অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে এই "গোষ্ঠী-বিভক্ত" স্বজন-সম্বোধন রীতি প্রচলিত। লাউই এবং অন্যান্য বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানীরা আজ এই স্বজন-সম্বোধন রীতিকেই আদিমসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছেন। মামা ও বাবার সম্বোধন অধিকাংশ আদিম মানব-সমাজে তো একই, তা ছাড়া আরও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রিভার্স লক্ষ্য করেছেন এই সঙ্গে। যেমন ফিজি দ্বীপের আদিবাসীরা একই নামে এতগুলি মানুষকে ডাকে :

(ক)

মামা
পিসেমশাই } = ভুঙ্গো
শ্বশুর

(খ)

পিসিমা
মামিমা } = ন্‌গেনাই
শাশুড়ি

(গ)

পিসতুতো ভাই-বোন
মামাতো ভাই-বোন } = ন্‌দাভোলা
শালা-শালী
দেবর ননদ

গুয়াদালকেনাল দ্বীপপুঞ্জেও এই রীতি প্রচলিত, যেমন—'ক' গোষ্ঠীর জন্য "নিয়া", 'খ' গোষ্ঠীর জন্য "তারুঙ্গা" এবং 'গ' গোষ্ঠীর জন্য "ইভা" শব্দ ব্যবহার করা হয়। এইরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রিভার্স বলেন যে, এই স্বজন-সম্বোধন থেকেই বোঝা যায় এগুলি সব মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিয়ে থেকে উৎপত্তি। তবে এর মধ্যে কোথাও মামাতো বোনকে, কোথাও পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার রীতি বেশি প্রচলিত, কোথাও দুই রীতিই সমান প্রচলিত। মামাতো এবং পিসতুতো উভয় বোনকে বিয়ে করার রীতিকে নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ্ ব্রাউন "বাইলেটারাল ক্রস্-কাজিন ম্যারেজ" এবং শুধু মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতিকে "ম্যাট্রিলেটারাল," পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার রীতিকে "প্যাট্রি-লেটারাল ক্রসকাজিন ম্যারেজ" বলেছেন। এর মধ্যে "ম্যাট্রিলেটারাল ক্রসকাজিন ম্যারেজ" অর্থাৎ মামার মেয়েকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত বেশি দেখা যায় কেন ?

মাতৃতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য মাতুলকর্তৃত্ব। ভাগ্‌নেরা মামার সম্পত্তি ভোগ করে, মামাদের সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকার পায় এবং মাতৃকুল থেকেই বংশ পরিচয় হয়। 'বাবা' এই মাতুলালয়ে প্রায় অতিথির মতন, তাঁর কোন অধিকার পুত্রের উপর নেই, পুত্র তাঁর সম্পত্তিরও ভাবী মালিক নয়। মা তখনও বাবার 'দাসী' হননি বলেই এই সমাজ-ব্যবস্থা। নারী ও পুরুষের অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সমান ছিল। বাবা সর্বময় 'প্রভু' হয়ে ওঠেননি। এ-ক্ষেত্রে এক-স্ত্রীর বহু স্বামী বা "পলিয়্যাণ্ডি", "গোষ্ঠীবিয়ে" এবং "প্যারালাল কাজিন-দের" বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকতে পারে। কারণ, প্রথমত নারী পুরুষের দাসী হয়নি, দ্বিতীয়ত খুড়তুতো-জেড়তুতো ভাই-বোনরা তাদের মায়ের কুলান্তর্গত। একই কুলে বিবাহ নিষিদ্ধ হলে, অন্য কুলে বিবাহ করতেই হবে এবং যে সব জাতি মাত্র দুটি গোষ্ঠীতে বা "ময়েটিতে" বিভক্ত, সেখানে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিয়েও

স্বচ্ছন্দে হতে পারে। এ ছাড়া মামাতো বোনকে বিয়ে করার প্রথা সম্বন্ধে রিভার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পৌঁছবার যুগ-সন্ধিক্ষণে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সমাজে যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, ভাগ্নের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মামারা সেই বিরোধ সাময়িকভাবে দূর করেন। ভাগ্নে হাতছাড়া শুধু নয়, কুলছাড়া হয়ে যাচ্ছে, মামার বদলে সে পিতার কবলিত হচ্ছে, মামার সম্পত্তির বদলে সে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে। মামার সম্পত্তি থেকে ভাগ্নে বঞ্চিত হচ্ছে, কর্তৃত্ব থেকেও। যুগসন্ধিক্ষণের এই সম্পত্তির বিরোধ বিবাহপ্রথার ভিতর দিয়ে প্রশমিত করার চেষ্টা হয়। এইসময় মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতি খুব বেশি প্রচলিত হতে পারে বলে রিভার্স মনে করেন। সুতরাং "ক্রস্-কাজিন" বিয়ের মধ্যেও প্রায় তিনটে স্তর নজরে পড়ে, দুটো তো স্পষ্ট।

বাইলেটারাল স্তর, প্যাট্রিলেটারাল স্তর, ম্যাট্রিলেটারাল স্তর। এর মধ্যে তিনটি স্তরই দুইটি "ময়েটিতে" বিভক্ত আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হওয়া আশ্চর্য নয়, আর কেবল তৃতীয়টি মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের যুগ-সন্ধিক্ষণের অন্যতম সামাজিক প্রথাও হতে পারে। মামা এই যুগ-সন্ধিক্ষণ থেকে বিদায় নিচ্ছেন নিশ্চয়ই, এবং মানব-সমাজে মামা-ভাগ্নের সভ্যতারও শেষ হয়ে যাচ্ছে এইখানে।

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার এই সব বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য মিলিয়ে তার ক্রমবিকাশের ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করাই নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাজ। এই দুরূহ কাজে মানুষের "টেক্‌নোলজি" বা উৎপাদন-হাতিয়ারগুলি যেমন অত্যন্ত মূল্যবান, "ইডিওলজি" বা ধর্ম, চিন্তা, দর্শন, পুরাণ-কথা, লোককথা ইত্যাদি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তার "কিন্‌শিপ ইউসেজ" অর্থাৎ স্বজন-সম্পর্ক এবং স্বজন সম্বোধনের শব্দগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'ক্রস্-কাজিন' বিয়ের প্রথা যেখানে আছে, অথবা 'লেভিরেট' ও 'সোরোরেট' প্রথা আছে,

সেখানেই দেখা যাবে "গোষ্ঠীবিভক্ত" স্বজন-সম্বোধন বেশি—অর্থাৎ বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, পিসে, মামা ইত্যাদির বদলে 'বাবা', ঐ রকম 'মা' ও 'ভাই-বোন' ইত্যাদি সূচক শব্দের (kinship terms) প্রচলন বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে তারপর দেখা যাবে এই সব বিবাহপ্রথা ও আত্মীয়তার সঙ্গে সম্পত্তি, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ইত্যাদির সমস্যা জড়িত আছে। সুতরাং এই ধারায় বিশ্লেষণ করলে আমরা সমাজের কাঠামোর পরিচয় পেতে পারি। এইভাবে আমাদের দেশেরও সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস লেখা যায়। এইজন্য আমাদের দেশের আদিম অধিবাসীদের স্বজন-সম্পর্ক ও স্বজন-সম্বোধন-সূচক শব্দগুলির অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাছাড়া বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে যে সব বিভিন্ন বিবাহপ্রথা, স্বজন-রীতি ইত্যাদির উল্লেখ বা অবশেষ পাওয়া যায়, সেগুলির পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাহলে ভারতবর্ষের সামাজিক ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আমরা স্পষ্ট জানতে পারি।

৮

দ্বিপদ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু

গরু ভেড়া ছাগল ঘোড়া কুকুর বেড়াল ও গাধার মতন 'মানুষ'ও এক জন্তু বিশেষ।

অন্তত প্রাণীবিজ্ঞানীরা তাই বলবেন। বলতে তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না, তাঁদের আত্মসম্মানেও বাধবে না। তবে জন্তুরও শ্রেণীভেদ আছে, ইতর-বিশেষ আছে। মানুষ স্তন্যপায়ী জন্তুর শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্তু। মানুষের যা কিছু গর্বের বস্তু তা হল তার 'মস্তিষ্ক' এবং সামনের দুখানা 'শৃঙ্খলমুক্ত পা'—যার নাম দিয়েছি আমরা 'হাত'। মানুষের দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক যে কত বড় তা অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। যেমন—

	দেহের ওজন	মস্তিষ্কের ওজন
	(কিলোগ্রাম)	
মানুষ	৬২	১·৩২
শিম্পাঞ্জী	৫৭	·৪৪
ওরাঙ	৭৩	·৩৭
ঘোড়া	৩৭০	·৫৩
গরু	৫৭০	·৪২

	দেহের ওজন	মস্তিষ্কের ওজন
	কিলোগ্রাম	
বাঘ	১৮৫	·২৬
সিংহ	১৯০	·২৬
কুকুর	১৩·৫	·০৮
বেড়াল	৩·৩	·০২৫
জলহস্তী	১৩৫০	·৫৮
হাতি	৬৬৫০	৫·৭

এই তালিকাটা ভাল করে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে মস্তিষ্কের দৌলতেই মানুষ নিঃসংশয়ে জীবশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। দাঁড়িপাল্লায় দেহ ওজন করলে একটা হাতির পাশে কম করেও একশ'জন মানুষ দাঁড় করাতে হবে, কিন্তু মাত্র চারজন মানুষের মস্তিষ্কের ওজন একটা বিশাল হাতির সমান। হাতিকে বশ করতেও মানুষের তাই বেগ পেতে হয়নি। আর কুকুর বেড়াল বাঘ সিংহ গরু ভেড়া ঘোড়া—এসব তো মানুষ বশীভূত করেছেই।

পাঠশালার গুরুমশাই আমাদের তোতাপাখির মতন বাল্যকাল থেকেই শিখিয়ে দেন যে কুকুর গরু ঘোড়া হল চতুষ্পদ জন্তু, গৃহপালিত প্রভুভক্ত, কেউ দুধ দেয়, কেউ পাহারা দেয়, কেউ গাড়ি টানে। ঠিক কথা, কিন্তু 'চতুষ্পদ' জন্তু সম্বন্ধে 'দ্বিপদ' জন্তুর এইটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। আমাদের সামনের পা দুখানা 'হাত' হয়েছে বলেই আমরা সোজা হয়ে চলতে শিখেছি, বাইরের ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। হাত আর মাথার দৌলতেই আমরা 'হাতিয়ার' গড়তে শিখেছি, সেই পাথুরে হাতিয়ার থেকে আজকের যুগের অ্যাটমিক হাতিয়ার পর্যন্ত। এই সংগ্রামের ফলে আমরা বাইরের বন্য প্রকৃতির রূপ বদলেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও অনেক বদলে গেছি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে, মস্তিষ্ক অনেক বড় ও শক্তিশালী হয়েছে, চেহারা বদলেছে। অন্যান্য জন্তুদের সংগ্রামের হাতিয়ার তাদের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন, যেমন দাঁত থাবা শুঁড় করাত ইত্যাদি।

আমরা যে আজও নখ দিয়ে আঁচড়াই নে বা দাঁত দিয়ে কামড়াই নে তা নয়, তবু যে বন্য বর্বর হিংস্র জন্তুর মতন আমরা ব্যবহার করি নে তার কারণ নখ দাঁতের বদলে আমরা অন্তত লাঠি ছুরি বা ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারি। আমাদের ভাষা আছে, অন্য জন্তুর ভাষা নেই। আমাদের মুক্ত 'রূপান্তরিত পা' দিয়ে (হাত) আমরা লিখতে পারি, আঁকতে পারি, বীণাতন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারি, অন্য পশুরা তাদের 'শৃঙ্খলিত পা' দিয়ে তা পারে না। তাই আমাদের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, 'কালচার' আছে, জন্তুদের নেই।

তাহলেও মানুষ বা 'দ্বিপদ' জন্তুর কাল্চারের ইতিহাস লেখার সময় এই সব মূঢ় মূক ম্লানমুখ 'চতুষ্পদ' জন্তুর কাছে ঋণ না স্বীকার করে উপায় নেই। এ-ঋণ বড় সামান্য ঋণ নয়। যারা নিজেরা 'সভ্যতা' গড়তে পারল না, যাদের 'কালচার' বলতে কিছুই নেই, তারা তাদের দূর-সম্পর্কের 'ভাইবোনদের' সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করল সভ্যতা ও 'কালচার' গড়তে। অবশ্য তারা যে স্বেচ্ছায় করেছে তা মোটেই নয়, তাদের পোষ মানিয়ে, বশ করে মানুষ তাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। সেটা মানুষেরই কৃতিত্ব, মানুষেরই বুদ্ধির বাহাদুরি, জন্তুদের নয়। যখন উড়োজাহাজ তো দূরের কথা, সামান্য গরুর গাড়ি পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, ডুবোজাহাজ কেন, সামান্য জেলে-ডিঙ্গী পর্যন্ত জলে ভাসেনি, তখন শুধু মানুষের একমাত্র চরণই ভরসা, আর আশা হল ঐ পশু। ঐ কুকুর গরু ঘোড়া উট বশ করে তাদেরই পিঠে চড়ে অথবা টানা গাড়িতে চড়ে মানুষ এই মাটির পৃথিবীর এককেন্দ্র থেকে আর এককেন্দ্রে অভিযান করেছে। এইভাবে চলতে না পারলে সে-যুগের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মানুষ। পশুর সবচেয়ে বড় দান হল—মানুষকে তারা এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছে। মানুষের আদিম বাহন হিসেবে পশু যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার তুলনা হয় না। শুধু চলার শক্তি হিসেবে নয়, খাদ্য হিসেবেও পশুর দান যথেষ্ট। যখন ফসল ফলাতে শেখেনি মানুষ,

তখন এই সব বন্য পশু শিকার করে বনের ফলমূল আহার করেই তাকে বাঁচতে হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য হিসেবে পশু লালন পালন করতে শিখেছে মানুষ বোধ হয়ঃফসল ফলাবার আগে। এইভাবে সভ্যতা ও কালচারের ভিত গড়ার সময় হাজার হাজার বছর ধরে যারা মানুষকে জীবনধারণের গতি, চলার শক্তি, সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে, স্কুলপাঠ্য আদর্শ রচনার বইয়ে তারা 'চতুষ্পদ' বলে বর্ণিত হলেও পরিচয় তাদের সেখানেই শেষ হয় না। অবশ্য কৃতিত্ব সবটাই মানুষের। বন্য হিংস্র জন্তুদের গৃহপালিত করে খাদ্য এবং মজুরশ্রেণীতে পরিণত করতে মানুষকে বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে এবং সে-বুদ্ধি তার মস্তিষ্ক যুগিয়েছে। শুধু বুদ্ধি নয়, মানুষের হাতে-গড়া হাতিয়ার পশুর চাইতে তাকে শক্তি-শালী করেছে। তবেই সভ্যতার বিরাট পিরামিড গড়ার কাজে মানুষ পশুকে কাজে লাগাতে পেরেছে।

সবরকমের পশু সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তাই একই স্তরের সভ্যতা একই সময় সর্বত্র গড়তে পারেনি মানুষ। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা পেয়েছিল শুধু কুকুর, তাই যুগ যুগ ধরে তারা আদিম শিকারীর সভ্যতার চাইতে একধাপও উঁচুতে উঠতে পারেনি। মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা, পেরু বলিভিয়ার ইণ্ডিয়ানরা লামা ও আল্পাকাকে পোষ মানিয়ে চলে বেড়িয়েছিল, তাই তারা অনেক উন্নত সভ্যতা 'মায়া কালচার' গড়ে তুলেছে। আর খাদ্য এবং চলার বাহন হিসেবে গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া গাধা হাতি উট ইত্যাদি জন্তু লামা আলপাকাদের তুলনায় অনেক ভাল পুষ্টিকর, শক্তিশালী ও বেগবান, তাই মিশর মেসোপোতামিয়া চীন ও আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে এক বিশাল সভ্যতা প্রায় একই সময়ে গড়ে উঠেছিল, যা অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। শিকারী মানুষের সভ্যতা গড়েছে কুকুর, চাষী-কুমোরের কৃষিসভ্যতা গড়েছে গরু-ঘোড়া-মহিষ, আর সভ্যতাকে পিঠে করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে ঘোড়া ও উট।

আমাদের ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টান্ত দিয়ে পশুর দানের কথা বলছি। ভূগোলে আমরা ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দেখতে পাই সেটা নিশ্চয়ই আকাশ থেকে এই আকারে মাটিতে পড়েনি। প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে এইভাবে গড়ে তুলেছে, হঠাৎ একদিনে বা একযুগেও নয়, যুগ যুগ ধরে শিল্পীর মতন খেয়ালী প্রকৃতি এই ভারতবর্ষের প্রতিকৃতি ভেঙেছে আর গড়েছে। ভারতবর্ষের ঠিক যে রূপটা আমরা এখন দেখতে পাই, খুব বেশি হলেও ছয় কোটি বছর আগে এইভাবে প্রকৃতি তাকে রূপায়িত করেছে। তারও আগে দক্ষিণভারত, অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা জুড়ে একটা বিশাল স্থলভাগ ছিল, আর বাকিটা ছিল মহাসমুদ্র। তারপর হিমালয়ের আবির্ভাব হয়—প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা, ১৫০ থেকে ২০০ মাইল চওড়া এবং কেন্দ্রীয় শিরায় প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু একটা বিশাল পর্বতশ্রেণীর এই অভ্যুত্থানের ফলে ভারতবর্ষ কালক্রমে এই রূপধারণ করে। আগেকার সেই মহা-সমুদ্রের একটা অতিক্ষুদ্র অংশ আজও টিকে আছে—ভূগোলে তার নাম "ভূমধ্যসাগর।"

হিমালয়ের অভ্যুত্থান আর স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব প্রায় একই সময় ঘটে। তারপর স্তরে স্তরে মানুষ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীর বিকাশ দেখেছে হিমালয়। হিমালয়ের পাঁজরে পাঁজরে কঙ্কালের (ফসিল) অক্ষরে লেখা আছে সেই ইতিহাস। যখন "প্রথম মানুষের" বিকাশ হল তখনও হিমালয়ের নিজেরই অভ্যুত্থানের পালা শেষ হয়নি। গা-মোড়া দিয়ে হিমালয় তখনও ঠেলে উঠছে ভূগর্ভ থেকে। সেই আদিম মানুষের আনাগোনা তখন হিমালয়ের গিরিপথ দিয়েই হয়েছে। এ ছাড়া আর অন্য কোনদিক থেকেই আদিম মানুষের যাতায়াত সম্ভব ছিল না তখন। চারিদিকেই তো সমুদ্র এবং কোন জলযানই তখন মানুষের জানা ছিল না। সুতরাং আজ নৃবিজ্ঞানীরা সকলেই প্রায় এ-বিষয়ে একমত যে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়েই 'আদিম মানুষ' আনাগোনা করেছে এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারতবর্ষে।

তাছাড়া হিমালয়ের গিরিপথগুলো তখন (অর্থাৎ প্রায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে, আদিমতম মানুষের আবির্ভাবকালে) এতটা উঁচু ও দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে গত ৫০,০০০ বছরের মধ্যেই হিমালয় আরও ৮০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট ঠেলে উঠেছে। সুতরাং আদিম শিকারী মানুষের এই পথে আনাগোনা করা সম্ভব ছিল। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল কুকুর।

কুকুরের কঙ্কাল মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পায় যা পাওয়া গেছে তা বিশেষজ্ঞদের মতে 'গ্রে-হাউণ্ড' এবং 'নেক্ড়ে' জাতীয়। অস্ট্রেলিয়ার 'ডিঙ্গো' কুকুরের বংশধর বলেও অনেকে একে মনে করেন। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা নিগ্রো জাতীয় হলেও (?), আদিবাসীদের মধ্যে অস্ট্রেলীয় সাদৃশ্যই বেশি। অস্ট্রেলীয় আদিম শিকারী মানুষ তাদের কুকুর সঙ্গে করে কি তাহলে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসতে পারে না ? আমরা পাথুরে যুগের কথা বলছি, ৫০০০০ থেকে এক লক্ষ বছর আগেকার কথা।

যখনকার কথা বলছি তখন উত্তরভারতে মরুভূমি ছিল না, জল জঙ্গল যথেষ্ট ছিল, এমন কি মাত্র দুতিন হাজার বছর আগেও ছিল। সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে গণ্ডার ও হাতির ছবি আঁকা শীলমোহর অনেক পাওয়া গেছে। কঙ্কালের টুকরোও যা পাওয়া গেছে তা থেকে বিশেষজ্ঞরা আজ একবাক্যে স্বীকার করেন যে এ-অঞ্চলে জলাজঙ্গলই ছিল বেশি এবং হাতি, গণ্ডার ও মহিষ অসংখ্য ছিল একসময়। সিন্ধু অঞ্চলের মানুষই যে মহিষকে পোষ মানিয়েছিল তাও তাঁরা বলেন। উত্তরভারতের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে গণ্ডার হাতি পরে আসাম সুন্দরবন ও টেরাই অঞ্চলে চলে গেছে। তবু সিন্ধু পাঞ্জাব অঞ্চলেই যে হাতি মহিষ ও গরু গৃহপালিত হয়েছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহই নেই। গরুর চাইতে মহিষই এ-অঞ্চলের চাষীর জীবনে কাজে লেগেছে বেশি। সিন্ধু সভ্যতার এইসব পশুর দান অসামান্য, বিশেষ করে হাতি ও মহিষের।

আর্যদের আসার আগে (খৃষ্টপূর্ব ১২০০-১৬০০) ভারতবর্ষে ঘোড়ার ব্যবহার দেখা যায় না। সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে ঘোড়ার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। অনেকে বলেন মধ্য-এশিয়ার স্টেপী অঞ্চলের ও দক্ষিণ রুশের আদিম জাতি প্রথমে ঘোড়া পোষ মানায়। এ নিয়ে মতভেদ আছে। তা থাক। আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষে আর্যরাই প্রথমে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছে। এই বেগবান দুর্ধর্ষ ঘোড়া আর ধারালো লোহার অস্ত্রই তাদের জয়ী করেছে, হাতি-মহিষ ও তামার বিশাল সিন্ধু সভ্যতা তাদের কাছে হার মেনেছে। ঘোড়ার কাছে হাতির এই চরম পরাজয়ের ঘটনা ইতিহাসে আর একবার ঘটতে দেখা যায়—গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীদের কাছে যখন পুরুর হাতিরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় তখন। আর্যদের কাছে শুধু ঘোড়া নয়, গরুও অন্যতম সম্পদ। সুতরাং আর্যসভ্যতাকে একদিক থেকে ঘোড়া ও গরুর সভ্যতা বলা যায়। 'সভ্যতার' মাপকাঠিতে আর্যরা সিন্ধুবাসীদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের ছিল, কিন্তু ঘোড়া বাহন হিসেবে এবং লোহা হাতিয়ার হিসেবে হাতি ও তামার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বলে তারা জয়ী হল এবং পরে শত শত বছর ধরে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান করে তারা বিরাট "হিন্দু কালচার" গড়ে তুলল।

এর পর সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে ইতিহাস সে হল ইসলামের "উট ও ছাগলের কাল্‌চারের" ইতিহাস। উট অবশ্য ভারতবর্ষেও ছিল এবং সিন্ধুবাসীরা যে তাকে পালন করেছে তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আরবদেশের ইসলামীয় সভ্যতায় সেরা দান হল উট ও ছাগলের। উট না থাকলে বিশাল মরুর বুকে পৃথিবীর এক অন্যতম সভ্যতা 'ইসলামের' বিকাশই হত না। তাই বোধ হয় এক উটেরই কয়েক হাজার প্রতিশব্দ আরবী ভাষাতে আছে যা আর কোন জন্তু বা জিনিসের নেই। উটের কাছে আরবী ভাষার ঋণ অসামান্য!

তারপর বৃটিশের আবির্ভাব আর এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাদের জয় হল, কারণ গরু-ভেড়া-উট-ছাগলের শক্তি ও সভ্যতাকে তারা সহজেই হার মানাতে পারল "বাষ্প ও বিদ্যুৎ" দিয়ে।

এইভাবে ইতিহাসের ধারা বিচার করলে দেখা যায় যে, চলার শক্তি মানুষের যত বেড়েছে, খাদ্য উৎপাদনের শক্তি যত বেড়েছে, তত সে ধাপে-ধাপে সভ্যতার আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়ে গেছে। এগিয়ে চলার তার বিরাম নেই। একসময় পালিত পশু তার সভ্যতার সৌধ গড়তে সাহায্য করেছে, আজ করেছে বৈজ্ঞানিক শক্তি, বাষ্প বিদ্যুৎ অ্যাটম্ ইত্যাদি। কিন্তু পশু যখন মানুষের একমাত্র সহায় ও সম্পদ ছিল, তখন অজস্র পশু "ব্যাঙ্কে" সঞ্চয় করে বিত্তবান হবার উপায় ছিল না মানুষের। তাই বলে তখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ যে ছিল না তা নয়, সবই ছিল, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর, এত ব্যাপক ছিল না। এখন সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করার উপায় হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের, করেছেও তাই তারা। আজ তাই মানুষে-মানুষে হানাহানির বিভীষিকা সর্বত্র এত বেড়েছে। শান্তি নেই মানুষের।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

রূপ-দেখানো

রূপকথা নয়, কথার কথাও নয়, ইতিহাসের কথা। রূপকথা অর্থে রূপের কথা বলা যায় এবং রূপদেখানোর কথা ও রূপের কথা মিলিয়ে 'রূপদেখানোর রূপকথা' স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। তবু এই নামের ও লেখার সামান্য একটু ইতিহাস আছে, বলা প্রয়োজন। বিখ্যাত একটি ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে একদিন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য মহৎ কিছু নয়, অসৎ কিছু তো নয়ই। সরল ভাষায় বলা যায়, উদ্দেশ্য পানভোজন ও রূপদর্শন। বিচক্ষণরা বলেন, তাতে হাড়গোড় পেশীস্নায়ু বেশ খানিকটা ঢিলে হয়ে যায়। দৈনন্দিন খাটা-খাটুনি ও চিন্তা-ভাবনাতে দৈহিক কলকব্জা যখন টাইট হয়ে থাকে, তখন ছেঁড়া-তারের মতন সেগুলোকে আলগা করার জন্য দরকার হয় ক্লাব-লাইফ। কথাটা একেবারে ব্লাফ নয়, কিছুটা সত্যি এর মধ্যে আছে। ক্লাবের উৎসবে তাই 'সভ্য' না হয়েও সভ্য ('মেম্বার' অর্থে) বন্ধুর অতিথিরূপে কতকটা 'অসভ্যের' মতনই হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুটি অবশ্য আমার কিছু মনে করেননি, কারণ মনটা তাঁর মুক্তোর মতন ঝক্‌ঝকে জানি। কিন্তু বন্ধুরও বন্ধুরা ছিলেন। তাঁরা কে কি মনে করেছিলেন

জানি না। বন্ধুটি যখন সোৎসাহে আমার সঙ্গে ক্লাবের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমি 'ওর্‌সম্যান', 'ব্যাট্‌সম্যান', এমনকি ভাল 'সেণ্টার ফরোয়ার্ড' নই বলে তাঁরা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে একটা সুদীর্ঘ 'ও—ও—' ধ্বনি করে হেসে অভ্যর্থনা করছিলেন, কেউ কেউ অভ্যাসবশত 'আই সি'-ও বলছিলেন। আমার অবস্থা তখন 'ইন্‌ দি সী'-র মতন, অথৈ জলে ব্যাঙাচির যেমন অবস্থা হয় তেমনি। কিন্তু তবু 'আই অ্যাম্ আই অ্যাম্, ইউ আর ইউ আর, হি ইজ হি ইজ'— এই বীজমন্ত্রের জোরে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে পড়লাম ক্লাবঘরে।

খেলাধুলো শেষ হল, বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কাপমেডেল বিতরণ করা হল। সন্ধ্যার পর মহিলারা প্রায় সকলেই এবং মহোদয়ারা কেউ কেউ চলে গেলেন। রাত্রি আটটার সময় ফিরে এলেন তাঁরা নাইট-পোশাক পরে। পানভোজন, নৃত্যবাদ্যোৎসব শুরু হল। রূপদর্শনে বিভোর হয়ে গেলাম, কিন্তু বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত হইনি। দেখলাম, মহিলারা সকলে বাক্স-আলমারী উজাড় করে যাঁর যা সেরা পোশাক ও অলঙ্কার ছিল সব পরে এসেছেন এবং এসেই শুধু ক্ষান্ত হননি, হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে সেগুলি দেখিয়ে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করছেন। মনে হল, সকলেই বলতে চান 'আমাকে দেখুন', অথচ এই দেখাদেখির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে-কাকে দেখে তার ঠিক নেই। আপনি যে বেশিক্ষণ কাউকে দেখবেন তারও উপায় নেই, অশিষ্টতা হবে। কারও কানের কুণ্ডল বা হীরের ভোমরা দেখছেন হয়ত তন্ময় হয়ে, এমন সময় আর-একজনের পেনড্যাণ্ট থেকে দ্যুতি ঠিকরে এল। না দেখে উপায় নেই। দ্যুতি ম্লান হতে না হতে তৃতীয় জনের মনসার ঘটের মতন সর্পফণাতুল্য খোঁপার 'ক্লোজ-আপ' দেখা গেল চোখের সামনে। আপনার মনে হল—'বিবিধ কুসুমে বাঁধিল কবরী শিথিল না ভেল ডোরী', মনে মনে আওড়ে নিলেন—

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী,
বন মালতী মালা তাহি উপরি।

দলিতাঞ্জন গুঞ্জ কলা কবরী,
ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী।

একবার চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে। এমন সময় চতুর্থ জন এলেন— 'নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা, তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা'—অতএব না দেখে উপায় নেই। দেখতে না দেখতেই, 'বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচূড়' মনোভাব নিয়ে হাত ঘুরিয়ে আর একজন এসে সামনে দাঁড়ালেন। গলায় গজমতি সাতসেরী হারের যুগ চলে গেছে, কিন্তু তবু তার আধুনিক সংস্করণটির দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যখন তিনি টেবিলের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন, তখন তাঁর দিকেও একবার আপনার ফিরে চাইতে হল। কত আর দেখবেন? চোখ মাত্র দুটো, তাই দিয়ে কি সব দেখা যায়? দেখতে দেখতে চোখ ক্রমে কপাল থেকে তালুতে উঠলেও দেখার আশা মিটবে না। নিউটন বলেছিলেন—'বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি নুড়ি কুড়ুচ্ছি, সামনে রয়েছে অসীম জ্ঞান-সমুদ্র, কূলকিনারা নেই তার।' আপনিও নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন—'আমি তো সেদিনকার শিশু, সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ফিডীং বট্‌ল চুষছি; সামনে আমার অগাধ রূপসমুদ্র, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ, অমৃত-মন্থনের শক্তি নেই।'

রূপদেখানোর এই শহুরে মেলায় বসে কত কবির কত রূপের বর্ণনা, বেশভূষার বর্ণনার কথা আমার যে মনে পড়ছিল তার ঠিক নেই। পরোটায় জড়ানো শিককাবাব খেতে খেতে আবোল-তাবোল অনেক কথা ভাবছিলাম। এত পোশাকের বাহার, এত অলঙ্কারের বৈচিত্র্যের কারণ কি? আমি অবশ্য কোনদিনই গোঁড়ামির পক্ষপাতী নই। ক্লাবমহিলাদের সেকালের কুলমহিলাদের মতন কবিকল্পিত বেশে আমি কোনদিনই দেখবার প্রত্যাশা করি না—

শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং।
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ॥

অর্থাৎ ঘোমটা-ঘেরা মাথা, স্বতঃই লজ্জাবনত, চলন মন্থরগতি, চোখ

চরণের দিকে নিবদ্ধ—এরকম কুলমহিলাদের এখনও যাঁরা দেখবার প্রত্যাশা করেন, আমি তাঁদের একজন নই। সম্ভব নয় দেখা। কুলমহিলাদের যুগ কেটে গিয়ে ক্লাবমহিলাদের যুগ এসেছে এখন। লোকসংখ্যা বেড়েছে দশগুণ, রাস্তাঘাটে ট্রাফিক বেড়েছে, সুতরাং অবগুণ্ঠনের প্র্যাক্‌টিক্যাল অসুবিধা আছে এবং অবগুণ্ঠিতা মহিলা 'সেফ্‌টি ফার্স্টের' নিয়ম পদে-পদে লঙ্ঘন করে ঝামেলা বাড়াবেন। 'লজ্জানতং' হয়েও পথেঘাটে চলা সম্ভব নয়, কারণ বাসে-ট্রামের ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। চরণকোটিলগ্নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও অসম্ভব। আর বর্তমান যুগে চরৈবেতির স্পীড এত বেড়েছে যে 'গতং চ পরিমন্থরং' খাপ খায় না তার সঙ্গে, খট্‌খটিয়ে চল্‌তেই হয়। অতএব পোশাক বদলানো ছাড়া উপায় নেই। সেকালের কবিরা "বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং" সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু পরিমিত মৃদুমধুর বাক্যে সবসময় কথা বলাও মহিলাদের পক্ষে এযুগে সম্ভব নয়।

চায়ের টেবিলে বসে কথাগুলো ভাবছি, এমন সময় 'ঝং' করে বাজনার শব্দ হল। নাচ আরম্ভ হবে। পুরুষ-নারীর যুগ্ম-নৃত্য—হাত তুলে বাজনার তালে তালে চতুষ্পদ-নৃত্য। দুজনের চারখানি পায়ের সঞ্চালন-কৃতিত্ব রীতিমত উপভোগ করবার মতন। বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেবের ভাষায় বলা যায়—'ভ্রূবল্লী-কমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধধৃষ্টস্তনং'। টীকা করলে অর্থ হয়—'ছলেন দর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অতএব মুগ্ধমনোহরং'। বাংলা ভাষায় বলা যায়—চঞ্চল ভ্রূযুক্ত নয়ন, ছলক্রমে ভুজমূলোত্তলনে স্তন-মণ্ডলের অর্ধাংশ প্রদর্শনাদি দ্বারা বিচিত্র মনোহর ভাবমণ্ডিত চতুষ্পদ যুগ্মনৃত্য। মনে হয়, এতই যদি করলে ধনি, তাহলে আধাআধি কেন? সাঁওতালদের নাচ দেখেছি, মুণ্ডা-হো-কোল-ভীলদের নাচ দেখেছি, কোন আধা-আধির ব্যাপার নেই সেখানে, কোন ছলছলনাক্রমে ভুজামূলার্ধ্বধৃষ্টস্তনং-এর কারিগরি নেই। নৃত্যের আরণ্যক উদ্দামতার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পরিস্ফুট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পিণ্ড্‌পণ্ড

বলের মতন নাকের ডগায় ছিট্‌কে এসে লাগল বুঝি! এখানে তা মনে হয় না। অথচ তাই মনে করার জন্যই ক্লাব করা, ক্লাবে নৃত্যোৎসবের আয়োজন করা। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক রুটিন থেকে মুক্ত হয়ে নিরাভরণ আরণ্যক জীবনের অবাধ স্বচ্ছন্দতা একটু টেস্ট করে দেখার জন্যই, তো ক্লাব! সদিচ্ছা আছে, সাহস নেই। ইচ্ছা আছে, জোর নেই মনের। সাহসের রঙচঙে মুখোস আছে, আত্মবিশ্বাস নেই। 'ড্যাশ্' আছে সকলের, কিন্তু 'ডেয়ারিং' কেউ নন। তাই সমস্ত উৎসবটা মনে হয় যেন কৃত্রিমতার সোনালি রাংতায় মোড়া, প্রাণের স্পর্শ নেই, রং নেই, তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস নেই, জীবনের বালুতটের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবার মতন বন্ধনহীন আবেগ নেই। অথচ বাসনা আছে, এইটাই ট্রাজিডি! জর্জেট-ক্রেপ-সিল্কের মসৃণতায় অঙ্গের তরঙ্গায়িত ভঙ্গী প্রতিফলিত করে ভুজমূলোত্তলন করে চতুষ্পদ নৃত্য করলেই যদি টাটকা সবুজ জীবনের স্বাদ পাওয়া যেত, তাহলে তো কথাই ছিল না। জীবনটা মাইনে-করা মালীর হাতে তৈরি সবুজ ঘাসের লন্ নয় যে যখন খুশি 'মোয়ার' দিয়ে ছেঁটে ফেললাম এবং জলসিঞ্চন করে ঘাস গজিয়ে তুললাম। তা যদি হত, তাহলে লুকিয়ে চুরিয়ে আমার মতন কচিঘাসবঞ্চিত যারা তারাও একবার লনে ঢুকে একটু ঘাস চিবিয়ে আসত। শকুন্তলার হাতের ঘাস না হলেও ক্ষতি ছিল না, মালীর হাতের ঘাসেই চলত! কিন্তু—জীবনটা তা নয়, তা হতে পারে না, তা হয় না, তা হয়নি কোনদিন। কি করে ক্লাবের মহোদয় ও মহিলাদের বোঝাব এই সহজ কথাটা! আর বোঝালেই বা তাঁরা বুঝবেন কেন? পোশাক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে হয়ত হ্যামলেটের মতন তাঁরা বলবেন—'The apparel oft proclaims the man', যদিও কি 'প্রক্লেম' করছে তা ভ্রূক্ষেপও করবেন না। রসেটির মতন বলবেন—

Fond of fun
And fond of dress and change and praise,
So mere a woman in her ways. (D. G. Rossetti)

আমি যদি বলি : 'What a deformed thief this fashion is ?' তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের ভাষায় উত্তর দেবেন : 'All this I see, and I see that the fashion wears out more apparel than the man. But art not thou thyself giddy with the fashion too that thou hast shifted out of thy tale into telling me of the fashion ?' (*Much Ado about Nothing*, iii, 3)। বলবার নেই কিছু। সামান্য কিছু শোনবার আছে, শুনুন। পোশাক ও ফ্যাশান সম্বন্ধে দুচার কথা, অর্থাৎ সেই সনাতন রূপদেখানোর রূপকথা।

সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে অনেকের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অস্পষ্ট, আধাস্পষ্ট, অনেক মুখ। একেবারে সেই আদিম অরণ্যের যুগ থেকে আধুনিক শহরের যুগ পর্যন্ত অনেক পুরুষ, অনেক মহিলার মুখ। মুখ দেখেই মনের ভাব বোঝা যায়। আদিম ঈভ আদমকে দেখে লজ্জায় জিব কেটেছিলেন কি না তা কেউ স্বচক্ষে দেখেননি। তবে আজও অরণ্যে পর্বতে আদিম জাতির অনেক ঈভ বাস করেন। কেবল বনের লতাপাতা আজও যাঁদের অঙ্গের একমাত্র আভরণ, এরকম আদিম বন্য জাতিরও অভাব নেই। লজ্জাসঙ্কোচের কোন চিহ্ন নেই তাঁদের মনের মধ্যে কোথাও, মুখে তার রক্তিম আভাও ফুটে উঠে না। তবু সর্বাঙ্গে লতাপাতার আভরণ কেন ? কেনই বা প্রায়নগ্ন দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে অলঙ্কৃত করার চেষ্টা ? ট্যাটুইং ইত্যাদির কথা বলছি। ব্লাউজ বা বুশ-শার্ট পরে আমরা জন্মাইনি এবং আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় নি। তবু তারা অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও দেহকে চিত্রিত করেছে কেন, কেন বনের ফুল লতাপাতা ছিঁড়ে অঙ্গের ভূষণ করেছে, নানারকমের জন্তুর হাড় ও পাথরের টুকরো সযত্নে গেঁথে গলার হার, মাথার

অলঙ্কার তৈরি করেছে? কেন? এই 'কেন' নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী, অনেক শিল্পী, অনেককাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা ও নৃবিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা কেউ বলেছেন 'সঙ্কোচ' (Modesty), কেউ বলেছেন 'অলঙ্করণ' (Decoration), কেউ বলেছেন 'রক্ষণাবেক্ষণ' (Protection)। 'সঙ্কোচ' সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়, সঙ্কোচ থেকে আদিম তালীপত্রের কর্ণকুণ্ডল বা আধুনিক জর্জেট শাড়ি, কোনটারই উৎপত্তি হয়নি। অলঙ্করণের যুক্তি অনেক জোরালো, অর্থাৎ রূপদেখানো ও রূপচর্চা, নিজেকে চলন্ত প্রদর্শনী করে তোলা মানুষের আদিমতম মনোবৃত্তি। তা না হলে বন্য যাযাবর শিকারীর স্ত্রীর বসে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে লতাগুল্মের আভরণে অঙ্গসজ্জা করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহের উপর বন্য অলঙ্কার কেবল রূপ দেখানোর মনোভাবকেই প্রকাশ করে, সঙ্কোচ বা লজ্জার কোন বালাই নেই তার মধ্যে, রক্ষণাবেক্ষণের যুক্তিও ধোপে টেঁকে না। কিন্তু প্রচণ্ড শীতগ্রীষ্মের মধ্যে পোশাকের রক্ষণাবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কার্লাইলের কথা মনে পড়ে: '...and thy clothes are not for triumph but for defence...Girt with thick, double-milled kerseys; half-buried under shawls and broadbrims, and overalls and mud boots, thy very fingers encased in doeskins and mittens...' (*Sartar Resartus*, IX)।

কিন্তু কেবল বেঁচে থাকার জন্য যে খাওয়া, তার জন্য চপ কাটলেট কোর্মা কোপ্তার দরকার হয় না যেমন, তেমনি কেবল আচ্ছাদনের জন্য যে পোশাক তার জন্য কয়েকদিন অন্তর ব্লাউসের 'কাট্' পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না, অলঙ্কারের ডিজাইনও রাতারাতি বদলাবার দরকার হয় না। সুতরাং আচ্ছাদন একটা কারণ হলেও খুব বড় কারণ বা আসল কারণ কখনই নয়। তা যদি হত তাহলে

একালের এত 'ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্স' চলত না এবং এত 'কাটারও' বেঁচে থাকত না। তাহলে কারণটা কি? ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন। প্রধান কারণ অলঙ্করণ এবং অলঙ্করণের প্রধান উদ্দেশ্য রূপ-দেখানো ও রূপবাড়ানো। সঙ্কোচ, লজ্জা বা ব্রীড়া, এসব কি তাহলে একেবারেই নেই, এমন কি শালীনতা ও শ্লীলতাবোধ পর্যন্ত। শুধু-শুধুই কি কবিরা এত কল্পনা এবং এত বাক্য ব্যয় করেছেন? সুতরাং সঙ্কোচ, লজ্জা বা শালীনতা কিছু একটা বস্তু নিশ্চয় আছে, বিশেষ করে পোশাকী সভ্যসমাজে। কিন্তু এই শ্লীলতা ও লজ্জা বস্তুটি কি? রূপদেখানোর ঠিক বিপরীত মনোভাব থেকে শ্লীলতা ও সরমের জন্ম (লজ্জা-সরমের 'সরম' কথাটি মনে হয় modesty-র প্রতিশব্দ হওয়া উচিত)। বিজ্ঞানীরা বলেন: 'Modesty is in fact a reaction against self-display' এবং এই আত্ম-প্রদর্শনই হল আসলে আদিমতম মনোবৃত্তি। সভ্যতার কয়েক ধাপ এগিয়ে সরমের উৎপত্তি হয়েছে এবং আত্মপ্রদর্শন বা রূপদেখানোর বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়াই হল সরমের মূলকথা। এইবারই কিন্তু আসল গণ্ডগোল। পোশাক সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত রহস্যময় প্রশ্ন। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করে অবশেষে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে আছেন। সমস্যাটা কি?

অলঙ্করণের উদ্দেশ্য হল রূপদেখানো, পোশাকেরও উদ্দেশ্য প্রধানত তাই। ফ্যাশানেরও উৎপত্তি এই রূপদেখানো ও রূপসীদের আভিজাত্যবোধ থেকে। কিন্তু শ্লীলতা ও সরমের উদ্দেশ্য হল রূপ না দেখানো, রূপ কেউ দেখে ফেলল মনে করে সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া। গোপীচাঁদের গীতে উদুনা রাণী যখন—

> খসাইয়া ফেলে হার কেয়ূর কঙ্কন
> অভিমানে দূর করে যত আভরণ।

নাকের বেসর ফেলে পায়ের নূপুর
পুছিয়া ফেলিল সব সীঁথির সিঁদুর।

তখন তাঁর রূপদেখানোর দরকার নেই বলেই খুলে ফেলে দিলেন সব অলঙ্কার। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের—'সিঁথীর সিন্দুর নয়নে কাজল মুকুতা শোভিত নখে', 'মুকুতা প্রবাল মণিময় হার পোতিক মাণিক যত', 'কস্তূরি চন্দন অঙ্গের ভূষণ, দেখিতে অধিক জোরি', 'কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কন কন কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে', কৃষ্ণকীর্তনের 'কাঞ্চুলী ভাঙ্গিয়া তন বিগুতিল', অথবা গোবিন্দদাসের—

বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী মালে।
সীথায় সিন্দূর লোচনে কাজর, অলকা তিলকা
চারুভালে।
চরণ কমলে রাতুল আলতা বাজন নূপুর বাজে।

অথবা 'নীল বসন মণি বলয়া বিরাজিত, উচ্চ কুচ কুঞ্চকভার, শ্রবণহি টাকট মণিময় হাটক কণ্ঠে বিরাজিত হার' ইত্যাদি রূপদেখানোর রূপকথা ছাড়া কিছু নয়। এমন কি কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মডাঁটার বালা ও তাগা, কানে কচি রিঠা ফলের ছুল, কেশ স্নানস্নিগ্ধ ও কবরীতে তিলপল্লব নিবদ্ধ করে পল্লীবধূরা যখন গ্রামের পথে যান তখন 'পান্থান্ মন্থরয়ত্যানাগরবধূর্বগসৎ বেশগ্রহঃ'—বেশ দেখে পান্থদের পথচলার গতিও মন্থর হয়ে আসে। শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল পরেই হোক, অথবা 'বকুলমালা দিয়া কুন্তল টানিয়াই' হোক, যে-কোন উপায়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য। এই রূপদেখানোর আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে পরবর্তীকালের সম্ভ্রম ও সরমবোধ যুক্ত হয়ে এক প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে রূপসীদের মনে। 'মডেস্টির' মূলকথা রূপ ঢেকে রাখা আর অলঙ্করণের

বড় কথা রূপ জাহির করা। অনেকে বলেন, 'মডেস্টি' হল সূক্ষ্ম মনের আবিষ্কৃত আকর্ষণের নতুন টেকনিক মাত্র। রূপ ঢেকে রাখার ভাণ করে রূপদেখানোই তার আসল কথা। কাঁচুলির উপর ঘন ঘন কাপড় টেনে দেওয়ার দৃষ্টান্তটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সরমে ঢেকে রাখা এবং প্রদর্শনের প্রবৃত্তিবশে উদাসীনদের আঙুল দিয়ে আত্মরূপ দেখানো—এই দুই উদ্দেশ্যই এখানে মনের কোণে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে, রূপদেখানোর বয়সে, অর্থাৎ কৈশোরে ও যৌবনে এই দুই পরস্পরবিরোধী বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে কমে যায়। তার মানে, যখন দেখাবার মতন অবস্থা থাকে তখনই দেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। খুল্লনার যখন বয়স হচ্ছে—'খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে' তখন—

গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা।
কুচশ্রী দাড়িম্ব ফল মাঝা মৃগরাজ তুল
উরু যুগ জিনি রামকলা॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে দিনে আন বেশ ধরে
চলে রাজহংসের গমনে।
রণে নূপুর বাজে নব নৃপ যেন সাজে
হেন মতে বাড়য়ে যৌবনে॥

(কবিকঙ্কণ)

গলায় 'শতেশ্বরী হার', হাতে 'তাড়বালা', আর 'গুরুয়া নিতম্ব ভরে' রাজহংসের মতন পথচলা—সবই কিন্তু খুল্লনার অজানা ধনপতির উদ্দেশে করা।

দেখানো ও না-দেখানো, অর্থাৎ 'ডেকরেশন' ও 'মডেস্টি'—এই দুয়ের দ্বন্দ্বই হল সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কারের গোড়ার কথা। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্লুগেল (J. C. Flugel) বলেন যে এই দুই

বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই হল 'the most fundamental fact in the whole psychology of clothing'। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে সবসময় আমরা এই বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করছি, চেষ্টার বিরাম নেই। এই বিরোধের মোটামুটি সমন্বয় থেকে, ম্যাকডুগাল (Macdougall) বলেন, 'Coyness' বা 'ন্যাকামির' উৎপত্তি হয়েছে। লজ্জায় ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা দেখানো, বারংবার কাঁচুলির উপর কাপড় টেনে শ্লীলতাবোধ জাহির করা, কথায় কথায় হাত ঘুরিয়ে ঘোমটা-টানার সময় সোনার চুড়ি-কঙ্কণের ঝঙ্কার শোনানো, অনুগামী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 'গুরুয়া নিতম্ব ভরে' রাজহংসের মতন চলা, অথচ লজ্জায় ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে থমকে যাওয়া—এসব হল অলঙ্করণ ও সরম, ডেকরেশন ও মডেস্টি, রূপদেখানোর ও না-দেখানোর দ্বন্দ্বজাত 'ন্যাকামির' দৃষ্টান্ত। ছুটি বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যদি সবসময় মনের মধ্যে চলতে থাকে, তাহলে তা থেকে ক্রমে 'নিউরসিস' দেখা দেয় এবং তখন আর হাবভাব বা চলনধরন সম্বন্ধে কোন চেতনাই থাকে না। শুচিবায়ের মতন বিশেষ ভঙ্গিতে চলার বায়, ভ্রূভঙ্গির বায়, কাপড়ের আঁচল টানার বায় ইত্যাদি অনেকরকমের বিচিত্র বায় দেখা দেয়। রূপদেখানোটা তখন আর সচেতন মনের ইচ্ছা থাকে না, অবচেতন মনের ইচ্ছা হয়ে ওঠে। ফ্লুগেল সাহেব এইজন্য পোশাকপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথা বলেছেন ঃ······"it may indeed be said that clothes resemble a perpetual blush upon the surface of humanity".

আগে বলেছি, একদিকে রূপদেখানোর প্রবৃত্তি, আর একদিকে রূপ না-দেখানোর প্রবৃত্তি, এই ছুই বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বই পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের মূলকথা। এই দ্বন্দ্ব থেকেই আধুনিক 'ফ্যাশানের' জন্ম। ফ্যাশানের ইতিহাস নৃবিজ্ঞানীরা ও মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, প্রত্যেকটি ফ্যাশানের আবির্ভাব থেকে অবলুপ্তি পর্যন্ত এই ছুই প্রবৃত্তির সংঘাতের উত্থান-পতন ছাড়া

তার মধ্যে আর কিছু নেই। ক্রোবারের (Kroeber) মতন নৃবিজ্ঞানী, ফ্লুগেলের মতন মনোবিজ্ঞানী ইয়োরোপীয় স্কার্ট ও ফ্রকের ডিজাইন কিভাবে যুগে যুগে বদলেছে এবং কেন বদলেছে, তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। যে-যুগে 'মডেস্টি' বা সরমবোধ প্রবল, সে-যুগে স্কার্ট ও ফ্রকের জবড়জং জোব্বার মতন ডিজাইনই প্রচলিত ছিল দেখা যায়। ক্রমে আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি যত প্রবল হতে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মহিমা ও সৌন্দর্য জাহির করার বাসনা যত উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে, ততই শ্লীলতা ও সরমের সীমানা ছাড়িয়ে স্কার্ট ও ফ্রকের ডিজাইন বদলাতে থাকে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মহিমা প্রকট করার জন্য কাটাররা কাটিংও বদলান। ইয়োরোপীয় স্কার্ট বা ফ্রকের মতন, আমাদের দেশের মেয়েদের ব্লাউসের 'ফ্যাশানের' উত্থান-পতন ও ডিজাইনের পরিবর্তন যদি কেউ অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন, তাহলে এই একই মনোবৃত্তির প্রকাশ তার মধ্যেও দেখতে পাবেন, অর্থাৎ সেই রূপদেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব। রূপদেখানোর প্রবৃত্তি বা বাসনা যখন উগ্র থেকে উগ্রতর হয়েছে তখন ব্লাউসের হাতা ও গলার কাটিং ছাঁটাই হতে হতে আভাসে দেখানোর সীমান্তরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ হাত ছোট হতে হতে কাঁধ পর্যন্ত উঠেছে এবং গলা নামতে নামতে অনেক দূরে নেমে গেছে। তারপর এসেছে আবার উল্টো ভাবের স্রোত, অর্থাৎ সরম ও শ্লীলতাবোধের স্রোত। তখন আবার হাত নামতে আরম্ভ করেছে এবং নামতে নামতে একেবারে কনুইয়ে এসে ঠেকেছে এবং গলা উঠতে উঠতে কণ্ঠপ্রান্তে বোতামবন্দী হয়েছে। এও কিন্তু স্থায়ী নয়। এই যে দেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব, এইটাই হল ফ্যাশানের মূল কথা।

মূল কথা হলেও, ফ্যাশান সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল প্রতি-যোগিতা এবং সামাজিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্যাশানের কোন অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে, অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, বাদ্‌শাহ-নবাবদের

যুগে। রাজা-রাজড়ারা, নবাব-বাদ্‌শাহরা, আমীর-ওমরাহ-অমাত্যরা যে পোশাক পরতেন, রাজান্তঃপুরের রাণী বা বেগমরা যে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন, বাইরের সাধারণ লোকের তা ব্যবহার করবার ক্ষমতা তো ছিলই না, হুকুমও ছিল না। আমাদের দেশে রাজপরিবারের লোক বা রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া কেউ মূল্যবান পোশাক (যেমন কর্ণকুণ্ডল, কঙ্কন, শিরোপা ইত্যাদি) পরতে পারতেন না, ইচ্ছা বা অর্থ থাকলেও না। রাজা খুশি হয়ে স্বর্ণকুণ্ডল বা কঙ্কন পুরস্কার দিতেন, খিলাৎ দিতেন। ধনিক সদাগররা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে পোশাক পরতে পারতেন না। এই প্রথা আমাদের দেশে অন্তত প্রায় ইংরেজ আমলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সুতরাং ফ্যাশান বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি তার অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে। 'ফ্যাশান' নিঃসন্দেহে এযুগের ক্যাপিটালিস্ট ডেমক্রাসীর দান। ক্যাপি-টালিজমের আর্থিক দম্ভ ও আভিজাত্যবোধ, শ্রেণীগত চেতনা ও ঔদ্ধত্যবোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি ইত্যাদি যেমন ফ্যাশানের মধ্যে আছে, তেমনি আবার ডেমক্রাসীর ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য-বোধও তার মধ্যে আছে। দুয়ের মিশ্রণে 'ফ্যাশানের' বিকাশ হয়েছে। কোটিপতি মিলমালিকের কন্যা যে শাড়ি বা অলঙ্কার পরবেন, তা পরবার অধিকার সামান্য কেরানীর কন্যারও আছে, যদি ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে অবশ্য। কিন্তু মধ্যযুগে এরকম কোন অধি-কারই ছিল না সাধারণ লোকের। ফ্যাশানের এই সর্বজনাধিকারটা খুব বড় কথা। তার জন্যই পোশাকের শ্রেণীগত সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা আধুনিক বুর্জোয়া ডেমক্রাসীর যুগে এত প্রবল। ফ্যাশানের দ্রুত পরিবর্তনের কারণও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সামাজিক শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাণিজ্যিক মুনাফাগত বা মনোপোলিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুইই। ক্যাপিটালিজমের পথে যেমন ক্রমেই আমরা মনোপোলির যুগে এবং মনোপোলিস্টিক প্রতিযোগিতার (ধনিকদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নয়) দিকে এগিয়ে গেছি,

মুষ্টিমেয় লোকের ডেমক্রাসী থেকে যেমন আমরা 'ম্যাস্ ডেমক্রাসীর' দিকে অগ্রসর হয়েছি, ঠিক তেমনি ফ্যাশানের পরিবর্তনশীলতাও অনেক বেশি বাড়তে আরম্ভ করেছে। এখন ফ্যাশান প্রচলন করেন শুধু ধনিকশ্রেণীর লোকরাই নন, বড় বড় ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের মালিকরাও। একটি ডিপার্টমেণ্ট স্টোর থেকে একটি ডিজাইন চালু করা হল, অমনি প্রতিদ্বন্দ্বী স্টোরের মালিকরা অন্যরকম ডিজাইন চালু করলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ফ্যাশান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, ইয়োরোপে সপ্তাহের মধ্যেও ফ্যাশান বদলাতে দেখা যায়। এছাড়া, অভিজাতদের কাছে 'ম্যাস্ ডেমক্রাসীর' সমস্যাও আছে। প্রিন্সেস্ বা ক্যাসানোভার ফ্যাশানদুরস্ত মহিলারা যে পোশাক শাড়ি ব্লাউজ পরে এলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যদি দেখা যায় সেই-রকম ব্লাউস পরে টেলিফোন গার্লরাও চলেছেন, তাহলে তাঁদের আভিজাত্যে সেটা বাধবে এবং তাঁরা আবার ব্লাউসের ডিজাইন বদলাতে বাধ্য হবেন। 'ম্যাস্ ডেমক্রাসী' ও 'মনোপোলিস্টিক প্রতিযোগিতার' এই বিপদ, কোন ফ্যাশানকেই কেউ কুক্ষিগত বা শ্রেণীগত করে রাখতে পারেন না। রাতারাতি ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের মালিকরা সেই ফ্যাশানের বা ডিজাইনের ব্লাউস তৈরি করে চালু করে দেবেন। পরের দিনই টেলিফোন মহিলা থেকে আরম্ভ করে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা পর্যন্ত যখন সেই ডিজাইনের ব্লাউস পরে রাস্তা দিয়ে চলবেন, তখন 'প্রিন্সে-সের' সম্ভ্রান্ত লেডীরা হতভম্ব হয়ে যাবেন। আবার দরজীর বাড়ি ছুটতে হবে ডিজাইন বদলাবার জন্য, কারণ আর যাই হন, তাঁরা "লেডী", শিক্ষয়িত্রী বা টেলিফোন অপারেটারদের মতন সাধারণ 'মিস' বা 'মিসেস্' নন। এই লেডীত্ব বজায় রাখার জন্য হয়ত সপ্তাহের মধ্যেই আবার ডিজাইন বদলাতে হয়। 'ডিপাটমেণ্ট স্টোরের' মালিক তাই দেখে আবার সেটি বাজারে চালু করে দেন, গঙ্গাস্নান করতে এসে গ্রাম্যবধূরাও একটি করে কিনে নিয়ে গায়ে পরে মিউজিয়ামে, জ্যুগার্ডেনে ঘুরে বেড়ান। 'ম্যাস্

ডেমক্রাসীর কাণ্ড দেখে লেডীদের চক্ষু চড়কে ওঠে। ফ্যাশান আবার বদলায়।

এইজন্য কতকাল আগে, ক্যাপিটালিস্ট ডেমক্রাসীর বাল্যাবস্থায়, ফ্যাশান সম্বন্ধে মহাকবি সেক্সপীয়র বলে গিয়েছিলেন : 'What a deformed thief this fashion is !' আজও সেক্সপীয়রের সেই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্য যে তা ক্লাবের উৎসবগৃহে বসে প্রতিমুহূর্তে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখছিলাম, মহিলারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পোশাক ও অলঙ্কারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আড়চোখে চেয়ে দেখছেন। মিসেস দত্ত দেখছেন মিসেস ঘোষকে, মিসেস বোস দেখছেন মিসেস মুখার্জিকে। রূপ-দেখানোর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে বসে আমি ভাবছিলাম, সকলের এই দেখাদেখির মধ্যে আসলে যিনি অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখছেন তিনি 'টেলার' ও 'কাটার'—এযুগের দেবতা তিনি। আগামীকালই তিনি নতুন ডিজাইনের অর্ডার পাবেন এবং আবার নতুন ফ্যাশান, অন্তত এ-পাড়ায় কিছুদিনের জন্য চালু হবে। রূপদেখানোর রূপকথার রাজকন্যাদের মহিমা বোঝা ভার! তাই কেবলই মনে হয় 'fashion wears out more apparel than the man !'

১০

নতুন বছর

[প্রতি ইংরেজী নববর্ষে পাঠ্য]

নতুন বছর পড়েছে, ইংরেজী মতে, নেহাৎ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, তাই। ইংরেজী নতুন বছর পড়েছে, বাঙালীরা তাকে যেমন ঠেকাতে পারেননি, তেমনি কিছুদিন পরে আবার যখন বাংলা নতুন বছর পড়বে, তখন ইংরেজরাও তাকে ঠেকাতে পারবেন না। বছরের গোণা দিন চিরদিন এমনি করে শেষ হয়ে যাবে, আবার সেই একই গোণা দিন নিয়ে নতুন নতুন বছর আসবে—পঞ্চান্ন'র পর ছাপ্পান্ন, ছাপ্পান্ন'র পর সাতান্ন। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই কিছু। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন যেমন, যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন তেমনি। কেবল এক-দুই-তিন থেকে নিরানব্বুই পর্যন্ত সংখ্যার তারতম্য। তাও ঠিক নয়। সংখ্যার চক্রাবর্তন বললে অনেকটা ঠিক বলা হয়। এক-একটা শতাব্দীর কথা চিন্তা করলে মনে হয় যেন, শিশু-শতাব্দী যুগের পর যুগ ধরে ধারাপাত আবৃত্তি করছে, সামনে গুরুমশায় 'মহাকাল' বসে আছেন। বিংশ শতাব্দী যেমন করছে, উনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীও তেমনি করেছিল। তার আগে শত শত, হাজার হাজার শতাব্দী

করেছে। হয়ত ভবিষ্যতেও করবে। 'হয়ত' বললাম, কারণ পারমাণবিক বোমার যুগে ভবিষ্যৎ খুব বেশী দূর পর্যন্ত ভাবা সমীচীন নয়। নতুন বছরের আবির্ভাব তাই কালের পাঠশালায় শিশুশতাব্দীর ধারাপাত আবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।

বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে আজ উচ্চারিত হল—পাঁচের পিঠে ছয় ছাপ্পান্ন। কারণে-অকারণে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেল। কেউ হাত দেখাতে, কেউ বর্ষফল গোণাতে, কেউ ক্রিকেট, কেউ সার্কাস দেখতে, কেউ সিনেমায় কেউ চিড়িয়াখানায়, কেউ আর্ট-এক্সিবিশনে, কেউ বা বনভোজনে—সকলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এক-এক পাড়ায় এক-এক রকমের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ এক-এক culture zone-এ এক-একরকমের উৎসব। কোন পাড়ায় জয়নগরের মোয়া ও কমলালেবু নিয়ে ছেলেমেয়েরা নাচছে, কোথাও বেলুন কিনছে আর ফুঁ দিয়ে ফাটাচ্ছে। কোনও এক পাড়ায় দেখলাম, রথের মতন সুসজ্জিত বিশাল একখানি মোটর গাড়িতে, দিব্যকান্তি এক সাধুপুরুষ বসে আছেন, রথ চলেছে এবং শত-সহস্র নরনারী তার পশ্চাদনুসরণ করছেন। হিমালয়ের গুহা থেকে বেরিয়ে নাকি বাবাজী 'নিউ ইয়ার ডে'-তে জব চার্ণকের কলকাতা শহরে এসেছেন। উদ্দেশ্য কি তিনিই জানেন। এ ছাড়া, অবিমিশ্র ইংরেজ এবং মিশ্র ইঙ্গ-ভারতীয় ও ইঙ্গবঙ্গ পাড়ায় যা দেখলাম, তা নতুন কিছু নয়। আমার আগে অনেকেই তা দেখেছেন। একশ বছর আগে কবি ঈশ্বর গুপ্ত যা দেখে 'ইংরাজী নববর্ষ' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই একই দৃশ্য—

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানাদ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা ঘর॥

মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদারের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবণ উড়িছে কত ফরফর করি॥

এই রকম সব দৃশ্য যা দেখলাম, তার মধ্যে 'সংকল্প' কোথাও খুঁজে পেলাম না। এও এক তামাসা। সঙ দেখার ও সঙ সাজার তামাসা। সংকল্পের যুগ চলে গেছে। বুঝলাম, সমাজে ও সংসারে সঙের সংখ্যা যদি এরিথমেটিক্যাল গতিতে বাড়তে থাকে, সঙের বিকল্প সংকল্পের মাত্রা জিওমেট্রিক্যাল গতিতে কমতে থাকে।

একশ বছর আগেকার কথা বলেছি। ঠিক একশ বছর আগে, বিংশ শতাব্দীর মতন যখন উনবিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—পাঁচের পিঠে ছয় ছাপ্পান্ন—তখনকার কথা, অর্থাৎ ১৮৫৬-র কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ছত্রিশ বছর, বাংলার সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা তিনি। তাঁর আন্দোলনের ফলে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছে এই ছাপ্পান্নতে এবং ছাপ্পান্ন সালেই তিনি প্রথম বিধবাবিবাহ দিয়েছেন এই কলকাতা শহরে। কলকাতার রাস্তায় কৌতূহলী লোকের ভিড় সেদিনও হয়েছিল। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভূনাথ পণ্ডিত প্রমুখ নবীন বাংলার মুখপাত্ররা বরের পালকির দুদিক ধরে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন। সেও এক দৃশ্য। এইরকম আর-এক ছাপ্পান্নর দৃশ্য। কিন্তু নবীন বাংলার মনে সংকল্প ছিল সেদিন, সাহস ছিল। আজকের বাংলায় সঙ আছে, সংকল্প নেই।

আরও একশ বছর আগেকার কথা বলি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ্পান্নর কথা। ১৭৫৬।

"সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন।"

কবি নবীনচন্দ্রের একথা তখনও সত্য হয়নি। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যদল ইংরেজদের কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করেছে। বণিকের আবার দুর্গের প্রয়োজন কি? আলীবর্দি খাঁ বলেছিলেন। সিরাজের কলকাতা-অভিযানের কারণ তাই। ইংরেজরা বন্দী ও পলাতক। বিজয়ী সিরাজ কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব হল। ঠিক এমনি এক ছাপ্পান্ন সালে, দু'শ বছর আগে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তার বিবরণ শুনেছেন, খুঁজলে এরকম দুচারজন লোক এখনও পাওয়া যেতে পারে।

তিন শতাব্দীর তিনটি ছাপ্পান্ন সাল। ১৭৫৬-১৮৫৬-১৯৫৬। যুগ হিসেবে তিনটি ছাপ্পান্ন'র নামকরণ করা যায়—সিরাজের যুগ, ইংরেজের যুগ, স্বরাজের যুগ। সিরাজের যুগ থেকে, ইংরেজের যুগের ভিতর দিয়ে, স্বরাজের যুগে আমরা এসেছি। কিন্তু অঙ্কে আর ইতিহাসে কত তফাৎ। ছাপ্পান্ন 'ইকুয়্যাল টু' ছাপ্পান্ন—অঙ্কের একথা সব সময় সত্য নয়। এক ছাপ্পান্নর সঙ্গে আর-এক ছাপ্পান্নর তফাৎ অনেক। প্রধানত সংকল্পের তফাৎ, আদর্শের তফাৎ। সমাজের তফাৎ, মানুষের তফাৎ।

১৯৫৬-র কোন সংকল্প নেই, এমন কথা আমি বলছি না। ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে, সিনেমা আছে, ফাট্‌কা বাজার আছে, বড়বাজার আছে, চাকরিবাকরি আছে, সাহিত্য আছে, সংবাদপত্র আছে, ময়দানের জনসভা আছে, সাধুবাবা আছে, অদৃষ্ট আছে যখন—তখন সেই সব ভিন্ন-ভিন্ন পথের যাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন সংকল্পও আছে। একটা কিছু সংকল্প মনে-মনে না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। যার কিছু নেই, আমরা বলি, তার স্বপ্ন আছে, কল্পনা আছে। তাও যার নেই, তার আছে সংকল্প। দুর্বল যে, পরাজিত যে, সে-ই 'দেখে নেব' বলে তার সংকল্প ঘোষণা করে। সংকল্প যখন দূর দিগন্তে ডানা মেলে দেয়, তখন হয় কল্পনা। অর্থাৎ শেলীর স্কাইলার্ক, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' —হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে? কল্পনা যখন ডানা গুটিয়ে মাটিতে নামে, তখন হয় সংকল্প। তখন সে ওয়ার্ডস্বার্থের

স্কাইলার্ক। সংকল্প নতুন বছরের হয়, বর্তমানের হয়, আগামী দিনের হয় না। যাঁরা ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টি পর্যন্ত সংকল্প করতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ মানুষ, তাঁদের কথা বলছি না। সাধারণ মানুষের কথা বলছি। যাঁরা প্রতি মাসের পয়লা তারিখে নিত্যনতুন সংকল্প করেন এবং মাসান্তে ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতন সব বাতিল করে দেন, তাঁদের কথা বলছি। ৩৬৫ দিনের বেশী চিন্তা করতে তাঁরা অক্ষম। তার উপর নতুন বছরে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যাঁদের 'ইনক্রিমেণ্ট' হল, তাঁদের সকলের সংকল্প একরকমের নয়। অনেকের 'বাজেট' নতুন বছরেও 'ব্যালান্স' করা সম্ভব হল না, ডেফিসিট থেকেই গেল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে "ডেফিসিট ফিন্যান্সের" যে জাদু আছে, পারিবারিক ক্ষেত্রে তা নেই। নতুন বছরের 'One Year Plan'-ও তাতে বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নতুন বছরে যাঁরা পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে এবং পঞ্চান্ন পেরিয়ে ছাপ্পান্ন বছরে পড়লেন, তাঁদের সংকল্পও এক হতে পারে না। ছাব্বিশের সংকল্প আর ছাপ্পান্ন'র সংকল্প এক নয়। তেমনি ষোল আর ছাব্বিশের সংকল্পেও অনেক তফাৎ। যতরকমের মানুষ ততরকমের মন এবং যেমন যার মন, তেমনি তার সংকল্প। সংকল্পের বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

আরও আছে। মানুষের সংকল্পের উপরেও দেবতার সংকল্প আছে, গ্রহ-নক্ষত্রের সংকল্প আছে। সংবাদপত্রে তা ছাপাও হয়ে গেছে, দেখেছেন নিশ্চয়। দৈবাচার্যরা তা গণনা করে বলে দিয়েছেন। একশ বছর আগেকার সংবাদপত্রে এসব ছাপা হত না। ক্রমে দৈবচার্যরা এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছেন। শত শত মৃত সংকল্পের মহাশ্মশানে আজ কেবল শনি-মঙ্গলাদি গ্রহের ভৌতিক পদ-সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং সংকল্পের কথা নয়, সংক্ষেপে নতুন ছাপ্পান্ন'র বর্ষফল শুনিয়ে শেষ করছি।

রবিবারে পৌষ কৃষ্ণ চতুর্থায়াং ছাপ্পান্ন
খৃষ্টসনের উৎপত্তিঃ।
তত্র অবতারঃ ক্ষ্যাপা বাবা ব্রজমোহনঃ।
পিপীলিকাবৎ অর্বুদাং মনুষ্যাং
তস্য পশ্চাদ্ধাবন্তি।
মশকবৎ গুণগুণন্তি মস্তকোপরি
পুষ্পকরথং মধ্যে মধ্যে,
যস্য জঠরাভ্যন্তরে হাইড্রোজেন-
বোমাঃ।
নাস্তি গোদাবরী-ভাগরথী-ভল্‌গা-
ক্যাসপিয়ান-মিসিসিপি-ইয়াংসি তীরে
শান্তিঃ-স্বস্তিঃ॥
ন পাপং ন পুণ্যং, ন্যায়ান্যায়ং
ভেদাভেদং।
সর্বতীর্থসারম্ ভেজালদ্রব্যসম্ভারম্
বড়বাজারম্।
পাদোনচতুর্হস্ত পরিমিত মানবদেহঃ,
প্রাণান্ত পর্যন্তং পরমায়ুঃ।
ইতি ইংরেজী ছাপ্পান্ন সালস্য লক্ষণং॥
অতএব সংকল্প মা কুরু, কেবল বক্তৃতায়াং
রতো নিত্যং। যতঃ পাপঃ ততঃ জয়ঃ।
ত্যজ সজ্জন সংসর্গম্ ভজ দুর্জনসমাগমম্॥

অবশেষে কেবল এইটুকু সংকল্প করুন—

Give us this year our Annual Bread
Lead us not to the Grave.

১১

নাইট-ক্লাব

'ক্লাব' বলতে আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে, একটা গা-ঢালা মনখোলা আড্ডার জায়গা বুঝি। সেদিন কলকাতার এক অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি চায়ের দোকান নজরে পড়ল—একটির নাম 'মজলিস', আর একটির নাম 'গুলটিস'। নামের টানে চা খেতে ঢুকে খোঁজ করে জানলাম, 'গুলটিসের' জন্ম পরে হয়েছে, 'মজলিস'কে টেক্কা দেবার জন্য। কলকাতা শহরে অনেক আধুনিক সব বাহারে নাম চায়ের দোকানের দেখেছি, কিন্তু এরকমটি আজ পর্যন্ত নজরে পড়েনি। 'মজলিস' ও 'গুলটিসের' মালিকদের টাকা বা শিক্ষা কোনটারই অহঙ্কার নেই, আছে কেবল আড্ডার বড়াই। তাই আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র চায়ের দোকানের নামটি তাঁদের এত 'কাব্যিক' হয়েছে। এই আড্ডা থেকেই 'ক্লাবের' জন্ম হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্লাবই প্রথম যুগে চায়ের দোকান কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, আজও যে ওঠে না তা নয়। 'ক্লাব' বলতে আধুনিক কালে আমরা যা বুঝি তা পাশ্চাত্ত্য সমাজের দান। 'ক্লাব' বা 'ক্লাব লাইফ' বলতে ঠিক যা বোঝায় তা আমাদের দেশে কোনদিনই ছিল না। তবে কি আমরা আড্ডা দিইনি

কোনদিন ? নিশ্চয়ই দিইছি। ইয়োরোপীয়দের তুলনায় আমরা কোন-দিক থেকেই কম আড্ডাবাজ নই। আমাদের দেশের রাজারাজড়ারা চিরকাল আড্ডা দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের রাজসভায় নবরত্ন সভার মতন নিয়মিত কাব্যের বিতর্কের ও রঙ্গরসিকতার সভা বসত। গোপাল ভাঁড় ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে নিয়ে এই রকম আড্ডা জমেছে। আমাদের দেশের রাজামহারাজারা নন শুধু, সাধারণ চাষী-কারিগরারও রীতিমত আড্ডা দিতে ভালবাসেন। গ্রামের মোড়ল ও মাতব্বরের চণ্ডীমণ্ডপে বা বাইরের প্রাঙ্গণে আড্ডা বসেছে চিরকাল এবং সেই আড্ডার বিশেষত্বটা এমনভাবে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে যে আজও আমরা 'ক্লাব' বা 'সঙ্গ' গড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক না দিয়ে, কলকাতার মতন শহরেও পাড়ায় পাড়ায় কারও বাড়ীর বারান্দায় অথবা বৈঠকখানায়, বড় জোর কোন চায়ের দোকানে আড্ডা জমাই বেশী। এইভাবে আড্ডা দেওয়াটাই হল আমাদের জাতীয় ধারা। একটা ঢিলে আল্‌গা ভাব এবং কোন রকমের নিয়ম শৃঙ্খলার অভাবই হল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ক্লাব' বলতে আড্ডার সঙ্গে একটা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ব্যাপারও জড়িত আছে এবং একটা সাংগঠনিক রূপও তার আছে। এইটাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের দান এবং 'ক্লাব' কথাটার উৎপত্তিও সেখান থেকে। কথাটা আধুনিক অর্থে বলছি, সামাজিক অর্থে নয়। সামাজিক অর্থে 'ক্লাব' বলতে যা আমরা বুঝি তার উৎপত্তি মানবসমাজের শৈশবকালে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ বলতে যা বোঝায় তার বিকাশের অনেক আগে, হাজার হাজার বছর আগে। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন, আধুনিক 'ক্লাব' বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই সেই আদিম যুগের মানবসমাজের দান, পাশ্চাত্ত্যের বা প্রাচ্যের নয়। সে-কথা পরে বলব।

আধুনিক কালের যে 'ক্লাব' তার জন্ম ইয়োরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে বলা চলে। ডক্টর জনসনের মতে, কয়েকজন স্বতঃপ্রণোদিত

"good fellows" যদি "under certain conditions" মিলিত হন, তা হলেই সেটা 'ক্লাব' হয়ে ওঠে। শোনা যায়, মধ্যযুগের এক-জন এক নম্বরের বোহেমিয়ান টমাস্ হককিভ্ ১৪০০ সালে নাকি এই রকম একটি প্রথম 'ক্লাব' অর্গানাইজ করেন। তারপর মহারাণীর রাজত্বকালে বেন জনসন যে মার্মেড ও অ্যাপোল্লো সরাইখানায় তখনকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়মিতভাবে জড়ো করতেন এবং অ্যাপোল্লোতে তাঁর এই সাহিত্যিক ক্লাবের জন্য যে আলাদা একটি ঘরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু সেকালের সরাইখানা ক্রমে লোপ পেয়ে যায় এবং তার বদলে 'কফি-হাউস' প্রথমে অক্সফোর্ডে ১৬৫০ সালে, তারপরে সমস্ত লণ্ডন শহরে ধীরে ধীরে অসংখ্য গজিয়ে ওঠে। 'কফি হাউস' গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক আড্ডাও নিয়মিত জমতে থাকে এবং ক্রমে তাসখেলা, পাশাখেলা, জুয়োখেলাও রীতিমত চালু হয়ে যায়। ১৬৯৭ সালে বিয়ানকো নামে এক ইটালীয়ান একটি 'চকোলেট-হাউস' খোলেন, কিছুদিন পরে এই চকোলেট হাউসই বিখ্যাত 'হোয়াইট ক্লাবে' পরিণত হয়। ক্লাবে লোকের ভিড় হচ্ছে দেখে সভ্য হবার চাঁদা ছয় পেনী করা হয়, নস্যের বদলে ভাল তামাক খাবার নিয়ম চালু করা হয় এবং বিশেষ অতিথিদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরেরও ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৩৬ সালের মধ্যে এই 'হোয়াইট ক্লাব' ধীরে ধীরে আর্ল ও ডিউকদের একটি প্রাইভেট ক্লাবে পরিণত হয় এবং তার নিয়ম-কানুনসহ সভ্য সংখ্যার বইও ছাপা হয়ে যায়। তারপর কিছু-দিনের মধ্যেই একই রাস্তার অপর-পাশে 'ব্রুক্স ক্লাব' বলে আর একটি ক্লাব গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের একটি টোরীদের, অপরটি হুইগদের প্রাইভেট ক্লাবে পরিণত হয়। এইভাবে কফি-হাউস, চকোলেট-হাউস থেকে ক্লাবের উৎপত্তি হল এবং সাধারণের ক্লাব থেকে ক্রমে আধুনিক সমাজের ক্লাব অভিজাতদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীকেন্দ্রিক ক্লাবে পরিণত হল। যে সমাজে, মানুষের

SENIOR B... COLLEGE

সঙ্গে মানুষের মানবিক সম্বন্ধের চেয়ে টাকা পয়সাটাই হল সমস্ত পদমর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড, সে-সমাজের 'আড্ডাখানার' বা ক্লাবের পরিণতি এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। এর পর ইংলণ্ডে 'ক্লাব' ঠিক ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে এবং তার রূপের বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের ও ওয়েল্‌সের রেজিস্টার্ড ক্লাবের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ১৩,৫১৩টি। এই হিসেব সম্পূর্ণ নয় এবং এর মধ্যে যে সমস্ত 'টাইপের' ক্লাব ধরা হয়েছে, তাও ঠিক নয়। এ ছাড়া, প্রত্যেক রকমের ক্লাবের নানারকম ডালপালা আছে, স্ত্রীলোকদের হাজার রকমের সংঘ আছে, যার হিসেব এই তালিকায় নেই। তা সত্ত্বেও এই হিসেব থেকে ইংরেজদের ক্লাব-জীবন ও ক্লাব-সভ্যতার একটা হদিস পাওয়া যায় নিশ্চয়ই। 'পরিবারের' চেয়ে 'ক্লাব'টাই যেন ইয়োরোপীয় সমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাচ্ছে বলে মনে হয়। 'পারিবারিক' যৌন-জীবন, যৌননিষ্ঠা, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি সব ক্লাব জীবনের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। 'নাইট-ক্লাবে'রও অন্ত নেই ইয়োরোপে। নাচ-গান-পান-ঢলাঢলির এক নম্বর আড্ডাখানা হল এই সব নাইট-ক্লাব। বোতলের-পর বোতল মদ উজাড় হচ্ছে, মদের নেশায় চোখের সামনে জোনাকি জ্বলছে, নেশার টানে জুয়োখেলার ঝোঁক চাপছে, ঝোঁকের চাপে মুঠো মুঠো টাকা ভেল্‌কির মতন উবে যাচ্ছে, অর্কেস্ট্রা বাজছে, নর্তকী নাচছে, ভাড়াটে সঙ্গিনীরা টলছে ঢুলছে—এই হল নাইট-ক্লাবের ছবি। মধ্যযুগের রাজাবাদ্‌শাহদের 'বাগান-বাড়ীর' বিলাস ব্যভিচার আজকের আধুনিক যুগে 'নাইট-ক্লাবের' আত্মসংযমহীন প্রমোদে পরিণত হয়েছে। আধুনিকতার পথপ্রদর্শক ইয়োরোপই তাই এই জাতীয় ক্লাবের জন্মদাতা।

আমেরিকাতেও এই ক্লাবের হুজুকটা জাগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে। হাজার হাজার ক্লাব ও অ্যাসোসিয়েশন সারা আমেরিকায় গজিয়ে ওঠে। মেয়েদের ক্লাবই হল মার্কিন সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। যদি কোন ফরাসী পর্যটকও আমেরিকা যান,

তাহলে তিনিও আমেরিকার 'মেয়েদের ক্লাবের' প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। ফ্রান্স এ ব্যাপারে ইয়োরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেও, আমেরিকা আজ ফ্রান্সকেও হার মানিয়েছে। ক্লাবের সভ্য হওয়াটা মার্কিন মেয়েদের ফ্যাশানের একটা অঙ্গবিশেষ। যে যত বেশি ক্লাবের সভ্য, সমাজ-জীবনে তার পদমর্যাদা তত বেশি। কিন্তু টাকাটাই হল মার্কিনী ক্লাব-সভ্যতার প্রাণস্বরূপ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, যে সব অঞ্চলে অবস্থাপন্ন পরিবারের বসবাস বেশি সেখানে ক্লাবের সংখ্যাও বেশি। ধনিক মার্কিন দুলালীদের ক্লাবপ্রীতিটা একটু উগ্র দেখা যায়, গরীবরা ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর সময় পান না। যেমন ওয়েস্টচেস্টারে শতকয়া ৫০ জনের বেশি মেয়ে ক্লাবের সভ্য, কিন্তু তার পাশেরই এক শহরতলীর শতকরা প্রায় ৭৬ জন মেয়ে নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত, কোন ক্লাবের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এও দেখা গেছে, যাঁদের রোজগার দশহাজার ডলারের উপর তাঁরা গড়ে তিনটি ক্লাবের সভ্য, আর যেসব মেয়ের রোজগার পাঁচ-হাজার ডলারের কম, তাঁরা গড়ে একটি ক্লাবের সভ্য কোনরকমে হতে পারেন। সুতরাং আমেরিকার ক্লাব-জীবনের যে আড়ম্বর সেটা সমাজের উপরতলার লোকের জন্য। টাকাটাই মার্কিনী সভ্যতার ক্লাব-কৌলীন্যের মাপকাঠি।

বাংলাদেশে ইংরেজরা আসার পরে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে, নানারকম সভা-সমিতি, সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন, সংঘ, ক্লাব ইত্যাদির বিকাশ হতে থাকে। এক-একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যেক সভা ও সংঘ গড়ে ওঠে—কোনটা রাজনৈতিক, কোনটা সামাজিক, কোনটা সাংস্কৃতিক। যেমন রামমোহনের 'আত্মীয় সভা', দেবন্দ্রনাথের 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা', 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ', 'বাষ্পীয় সভা' ইত্যাদি। এগুলি হল সামা-জিক ও সাংস্কৃতিক সংঘ। এরই পাশাপাশি আমোদ প্রমোদ ও অব-সরবিনোদনের জন্য 'ক্লাবও' অংকুরিত হতে থাকে। রামমোহন-

দ্বারকানাথের মতন সমাজের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন এবং তাঁদের চা-পার্টি ইত্যাদিতেও নিয়মিত যোগদান করেন। ক্রমে ভোজসভা, নাচসভা প্রভৃতির আয়োজন তাঁরা নিজেরাও করেন এবং সেখানে নাচ-গান-পান-হল্লা সবই চলতে থাকে। সাহেবরাও এইসব ভোজসভায় নাচসভায় আপ্যায়িত ও আমন্ত্রিত হতেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ী, ঠাকুর-রাড়ী, মল্লিকবাড়ী থেকেই ভোজসভা নাচসভার ভেতর দিয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয়ান ফ্যাশানের ক্লাবের বিকাশ হয় ধীরে ধীরে। তারই পরিণতরূপ আজকাল আমরা দেখতে পাই, রোটারীর লাঞ্চে, হিন্দুস্থান ক্লাব, স্যাটার্ডে ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব ইত্যাদির অভিজাত সামাজিকতায়। যে ধরনের হোক একটা সাংস্কৃতিক মুখোস এই সব ক্লাবের আছে, কিন্তু সেটা নিতান্ত গৌণ দিক। তার প্রধান দিক হল অবসরবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান-পান ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এনার্জি পরিপূরণ করা এবং তার মধ্যে সামাজিক শ্রেণীকৌলীন্য অটুট ও অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থবন্ধন সুদৃঢ় করা। এই সব ক্লাবের দুর্ভেদ্য শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীরটাই হল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ লোকের যদি সখ হয় তাহলে হাতে হঠাৎ কিছু পয়সা এলে তাঁর সখ মেটাবার জন্য 'প্রিন্সেস্' 'ক্যাসানোভা' পর্যন্ত যেতে পারেন, কিন্তু এইসব ক্লাবের সভ্য হতে পারেন না। চায়ের ব্যবসা করে বা রেস্টুরেন্ট খুলে একজন লক্ষপতি হলেও 'প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে' তাঁর প্রবেশ নিষেধ। এই জাতীয় ক্লাব ও অ্যাসোসিয়েশনের এই আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধটাই বড় বিশেষত্ব। আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান-পান-হল্লাও একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ।

শোভাবাজার রাজবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, মল্লিকবাড়ীতে যখন ভোজ-সভায় ও নাচসভায় সাহেব-বাঙালীর ঢলাঢলি, মদ্যপান, বাইজী-নাচ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল, তখন বাঙালী সমাজে তার অনু-করণের প্রবল প্রবৃত্তি জাগাটাও স্বাভাবিক, বিশেষ করে নতুন ইংরেজী

শিক্ষিত আধা-সাহেবদের মধ্যে এবং ইংরেজের প্রসাদজীবী শহরের হঠাৎ-বড়লোকদের মধ্যে হলেও তার অনুকরণ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকল। এই ধরনের গা-ঢালা স্ফূর্তির ব্যাপারটা নব্যযুগের কাল-চারের একটা অঙ্গ হয়ে উঠল। তার উপর রামমোহন রায় যখন শহরের বিখ্যাত নিকী বাইজীর নাচ দেখতে ভালবাসেন, বেদান্তচর্চার সঙ্গে যখন বাইজীনাচও চলতে পারে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন উদ্‌-যোগী প্রগতিশীল ব্যক্তিও যখন বাগানবাড়ীতে ঘন ঘন নাচগান ভোজ-সভার আয়োজন করতে পারেন, তখন অন্যান্য সব বাঙালী হঠাৎ-বড়-লোকদের ও নব্যবাবুদের আর ভাবনা কি ? এই সময় হাফ্-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, কবি পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করল। শহরের যুবকরা 'গোকুরী', 'ঝকমারী' ও 'পক্ষীর-দলে' বিভক্ত হল। শ্যামবাজার রামবাজার, চকবাজার, বাগবাজার, বৌবাজার, জোড়া-সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরা হাফ্-আখড়াইয়ের দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার ও গেরস্তগোছের হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ্-আখড়াইয়ের দৌলতে চাকরিও জুটে গেল। স্বয়ং মহারাজা নবকৃষ্ণই ছিলেন কবির দলের বড় পেট্রন। তাঁরই আমলে রাম বসু, হরু, নিলু, জগা, ভোলা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তাঁর দেখাদেখি শহরের অনেক বড়মানুষ কবির দল করতে মাতলেন। বাগবাজারের 'পক্ষীর দল' এই সময় গজিয়ে ওঠে। পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার। বাগবাজারের রিফর্মেশনে তিনি নাকি সেকালে রামমোহনের সমতুল্য লোক ছিলেন। তিনিই বাগবাজারকে উড়তে শেখান। কিছুদিনের মধ্যে বাগবাজারেরা শহরের টেক্কা হয়ে ওঠে। পক্ষীর দলের একখানা পাবলিক আটচালা ছিল। দলের সভ্যরা সেই আটচালা ঘরে বসে নানারকমের পাখী সাজতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন। বোসপাড়ার মধ্যেও দুচারটে গাঁজার আড্ডা ছিল। এই সময় কলকাতা শহরে গাঁজা খাওয়াটা ফ্যাশানে

পরিণত হয়েছিল বলা বলে। শহরের স্থানে স্থানে এক-একটা বড় গাঁজার আড্ডা গজিয়ে উঠেছিল—বাগবাজারে, বটতলায়, বৌবাজারে, কালীঘাটে। রামমোহন-দ্বারকানাথ নিজেরা যখন সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা করতেন, বাইনাচ দেখতেন, তখন নব্যযুগের বাবুরা যে দিনে ঘুমিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলির লড়াই দেখে, সেতার এসরাজ বীণা বাজিয়ে, কবি হাফ্-আখড়াই পাঁচালী শুনে, রাত্রে বারাঙ্গনাদের গৃহে গীতবাদ্য আমোদ করে কাল কাটাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি উড়ানো সে-সময় শহরের ভদ্রলোকদের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক-এক জায়গায় লোহার জাল দিয়ে ঘিরে অনেক বুলবুলি পাখী রাখা হত এবং মধ্যে মধ্যে এদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখা হত। সেই কৌতুক দেখবার জন্য শহরের লোক ভেঙে পড়ত। ঢাউসঘুড়ি, মানুষঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রকার ও উড়ানোর প্রণালী অনেক রকমের ছিল। ভদ্রলোকের ছেলেরা গড়ের মাঠে গিয়ে ঘুড়ির খেলা দেখতেন।

ইংরেজদের অবসরবিনোদন এবং সামাজিক আমোদপ্রমোদের রীতিটা বাঙালী বাবুরা প্রথম যুগে এইভাবে গ্রহণ করেন। ইংরেজ-দের সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশনের বৈশিষ্ট্যটা বাঙালী শিক্ষিত সমাজ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজে লাগাননি, তা নয়। যথেষ্ট লাগিয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যরা বা 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ভাল-ভাল অনেক 'সাংস্কৃতিক সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন, কয়েকটি রাজনৈতিক সংঘেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল। আমাদের স্থিতিশীল সমাজ-জীবনে এই সব 'সংঘ' ও অ্যাসোসিয়েশন নতুন প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সামাজিক আমোদপ্রমোদের রীতিটা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বিশেষ কোন রুচিসম্মত রূপ নেয়নি। নব্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতির গুরু-স্থানীয় যাঁরা, তাঁরাই এক্ষেত্রে রীতিমত বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মধ্যেও তাই মদ খাওয়া, এমন কি গরু খাওয়াটা পর্যন্ত প্রগতিসূচক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে ইংরেজদের

অনুকরণটা ভাল দিকে হয়নি। একটা বদ্ধ ডোবার মতন পচাগলা সমাজে হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার বহুমুখী খরস্রোত যদি প্রচণ্ড বেগে মিশে যায়, তাহলে প্রথম দিকে তার তলার শতাব্দীসঞ্চিত পচা পাঁক পর্যন্ত বজ্‌বজিয়ে ওঠে। কলকাতার বাঙালী সমাজে প্রথম দিকটায় ঠিক তাই হয়েছিল। নবাবী আমলের দুর্নীতি ও কুসংস্কারের পঙ্ককুণ্ড হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য জীবন-ধারার গতিশীল আবর্তে কাঁচা ড্রেনের ময়লার মতন চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বজ্‌বজিয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও এখানে অবশ্য আর একটা দিক বিচার করার আছে। ইংরেজরা যে আমাদের সবই ভাল করেছেন, তা একেবারেই সত্যি নয়। জর্জ টমসন আর ডেভিড হেয়ারের মতন ইংরেজের সঙ্গে, অথবা উইলসন-কোলব্রুকদের সঙ্গে সেকালের ইংরেজ লাটবাহাদুরদের, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও সিবিলিয়ানদের কোন তুলনাই হয় না। উইলসন-হেয়ার-টমসন এঁরা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নির্যাসটুকু নিয়ে এসে আমাদের দান করেছিলেন, আর ইংরেজ লাটবেলাট, ব্যবসায়ী ও সিবিলিয়ানরা তার বিষাক্ত বীজাণুগুলো এনে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন। প্রথম দলের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সাংস্কৃতিক সংঘ, রাজনৈতিক সংঘ, নানারকমের 'সোসাইটি' ও 'অ্যাসোসিয়েশন'। আর দ্বিতীয় দলের কাছ থেকে পেয়েছি ভোজসভা, নাচসভার ভেতর দিয়ে 'পক্ষীর দল' 'গাঁজার আড্ডা', 'মাতালের আড্ডা', বাইনাচ, খেমটানাচ, কবিপাঁচালীর আসর এবং তার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক কালের বাঙালী বড়বাবুদের সব 'ক্লাব'। সেকালের কলকাতার গাঁজার আড্ডা, মদের আড্ডা, বাইনাচ ও খেমটানাচের আসরই আজ নবকলেবর ধারণ করেছে মহানগরের 'নাইট ক্লাবে'।

তাহলেও বাঙালীর ক্লাব-জীবন :বা দেশী দেহাতি ভাষায় যাকে 'আড্ডা' বলি, তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল তার আবেগপ্রাধান্য এবং অসংযম-প্রবণতা। যে-কোন আড্ডাতে বসলে আমরা বাঙালীরা সাধারণত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি,

সময় বা পরিবেশ কোন কিছুরই যেন চেতনা থাকে না। চেতনা হারিয়ে ফেলে আড্ডার মহাসমুদ্রে যেন আমরা ডুবে যেতে চাই। ডুবে যেতেই যেন আমাদের ভাল লাগে। তাসের আড্ডাই হোক আর দাবার আড্ডাই হোক, জুয়ার আড্ডাই হোক, অচৈতন্য হয়ে যাওয়াটাই আমাদের স্বভাবধর্ম। এর মধ্যে আর একটা দিকও আছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রীলোকের সঙ্গ, নেশা এবং খিস্তিখেউড়ের দিকে আমাদের চারিত্রিক প্রবণতাটা যেন একটু বেশী, বিশেষ করে আড্ডার সময়। নারীসঙ্গ ও নেশা না হলে বাঙালীর কোন আড্ডাই যেন জমতে চায়-না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে আমোদ করাটাই যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনরকম কৃত্রিমতা যেন আমরা সহ্য করতে পারি না। কোন হিসেবের রুদ্ধকারায় আমরা বন্দী হতে চাই না, বেহিসেবীর দিগন্তরেখায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বিলীন করে দিতে চাই। তাই গণিকালয়েও আমরা যেন বণিকের হিসেবী মন নিয়ে যেতে পারিনে। 'পতিতালয়কে'ও আমরা অকৃত্রিম মনের রঙ দিয়ে 'কবিতালয়' করতে চাই। বারবনিতারা যেন কতকটা স্বভাবতই আমাদের 'কবিতা-কল্পনালতা' হয়ে ওঠে।

কথাগুলো শুনে রুচিবাগীশ ও নীতিবাগীশরা যেন ভ্রূ কুঁচকাবেন না। সমাজবিজ্ঞানীরা নীতিবাগীশদের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করেই সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ করেন। নৃবিজ্ঞানীরা তো করেনই। এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ম্যানিলাউস্কির একটা কথা বলে সকলকেই সাবধান করে দিচ্ছি: 'নৃবিজ্ঞানী ও সামাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য হল, জীবনের ঘটনাবলী সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করা, অবশ্য যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক ভাষায় এবং আমার মনে হয় তাতে কোন রুচিবাগীশের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়।' অশ্লীল রচনা যাঁরা খোঁজেন তাঁদের এ-সব বৈজ্ঞানিক রচনায় কোন ক্ষুধা মিটবে না। অপরিণত তরুণ মনকেও এ-রচনা বিষিয়ে তুলবে না। এখানেও যখন সেই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক আলোচনা করা হচ্ছে, তখন টিকি নেড়ে চোখ রাঙানোর কোন

সুযোগ নেই। 'ক্লাব' ও 'আড্ডা' আজকের বাঙালী সমাজের একটা মস্তবড় দিক। তার বৈশিষ্ট্যগুলিও তাই উপেক্ষা করা যায় না। কেন আমাদের দেশে ঠিক ইয়োরোপীয় মডেলে 'আড্ডা' দেওয়ার রীতি চালু হয়নি, কেনই বা সেরকম নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ 'ক্লাব' অসংখ্য গড়ে উঠেনি, সেটা বিচার্য বিষয়। যদি বলি আমাদের চরিত্রের অকৃত্রিমতা ও আবেগপ্রবণতা, আমাদের মাত্রাতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতামুখিতাই তার প্রধান কারণ, তাহলে বোধ হয় খুব ভুল বলা হয় না। ইয়োরোপীয় নেশা-পান ও অবাধ নারীসঙ্গের দিকটাও আমাদের 'ক্লাব' গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহিত করেনি। তার কারণ ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের সমাজে প্রকাশ্য বিধিসম্মত গণিকাবৃত্তির প্রচলন ও প্রসার হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের ক্লাব-জীবনের অবাধ নারীসঙ্গ ও নেশা-পানের দিকটা গণিকালয়েই আমরা মিটিয়ে নিয়েছি। বারবনিতা-কেন্দ্রগুলিই এদেশের অসংখ্য 'ক্লাব' ও 'নাইট-ক্লাবে' পরিণত হয়েছে। সামাজিক সংঘজীবন, মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব, জটলা পরামর্শ ইত্যাদি আমরা চায়ের দোকানের আর প্রতিবেশীর বারান্দার আড্ডায় সেরে নিই। বাংলাদেশের মতন অলি-গলিতে চায়ের দোকান বোধ হয় আর কোন প্রদেশে নেই। নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধন মেনে, কৃত্রিম ঢলাঢলি মেলামেশার জন্য আমরা তাই ইয়োরোপীয় মডেলের 'ক্লাব' গড়ার দিকে তেমনভাবে ঝুঁকি নি। এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই হয়েছে। আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জন্মেছিলেন, তেমনি আবার তন্ত্রোপাসনার এমন উর্বর ক্ষেত্রও আর কোথাও ছিল না। সেই তন্ত্রের আদিম অকৃত্রিম ধারাই আমাদের বাঙালীদের রক্তে বইছে। তন্ত্রসাধনার "মদ-মাংস-মেয়েমানুষের" মূলে রয়েছে আদিম মানব-প্রবৃত্তি। সেই আদিমতার উত্তরাধিকার সমাজ-জীবনের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার ক্ষেত্রে আজও আমরা সকলে বহন করে চলেছি। বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে প্রাগার্য যুগের আদিম সংস্কৃতির যে

প্রবাহ আজও বয়ে চলেছে, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও প্রবলভাবে, আমাদের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার ধারার উৎপত্তি সেখান থেকে। এইটাই আমার আসল বক্তব্য।

বাঙালীর 'বন্ধুত্বেরও' এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যা সচরাচর অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। বন্ধুত্বের মধ্যে স্তরভেদ আছে অন্তরঙ্গ-তার দিক দিয়ে। 'বন্ধুত্ব' আমাদের গড়ে উঠলেও, 'বন্ধুত্ব' আমরা পাতাই। এই বন্ধুত্ব 'পাতানোটা' হল একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা। বন্ধুত্ব 'পাতাই' মানে আমরা বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা ঠিক 'বিবাহের' মতন একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করি। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, এখানে কোন বর্ণভেদ বা জাতিভেদ নেই। বন্ধুত্ব পাতানো হলে দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যে একটা সামাজিক মেলামেশা ও লেন-দেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঠিক 'বিবাহের' ভিতর দিয়ে যেমন দুটি বিভিন্ন পরিবারের আত্মীয়তা ও সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয়, তেমনি হয় বন্ধুত্বের ভিতর দিয়েও। প্রাণের বন্ধুকে আমরা 'মিতে' বলি, তার সঙ্গে আমাদের 'হরিহর আত্মা'। মিতের মাকে মা, বাবাকে বাবা পর্যন্ত বলতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। সাধারণত দুই মিতের এক নামকরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুরুষদের মধ্যে এখন এই 'পাতানো' বন্ধুত্বের খুব বেশি চলন না থাকলেও, আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এখনও এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। তরুণী ও যুবতী মেয়েরা যে-কোন ফুলের নামকরণ করে বন্ধুত্ব পাতায় এবং সেই ফুলের নাম ধরেই পরস্পরকে ডাকে—যেমন 'বকুল', 'যুঁই', 'গোলাপ', 'শিউলি', 'বেল' ইত্যাদি। এ ছাড়া 'সই' বা 'মকর' পাতানো আজও আছে। এই সব বন্ধুত্বই শুভ দিনক্ষণ দেখে একটা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পাতানো হয়ে থাকে। বর্ণবিচার বা শ্রেণীবিচার না করে মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের 'সই' ও 'মকর' পাতানো, যুঁই, বেল, বকুল পাতানো, আমরা ছেলেবেলা থেকে কলকাতা শহরেই ধনিক ও মধ্যবিত্ত

বাঙালী সমাজে যথেষ্ট দেখেছি। সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এই যে বর্ণ-বৈষম্যহীন 'মিতে' ও 'সই' পাতানো, এরও মূল রয়েছে আমাদের আদিম মানব-সমাজের মধ্যে। বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে এও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'আদিম' উত্তরাধিকার, যা কোনও সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়।

আদিম মানব-সমাজে 'পরিবার', 'ক্ল্যান' বা 'সিব' ছাড়াও আরও একটি 'ইনস্টিটিউশনের' সন্ধান নৃবিজ্ঞানীরা পেয়েছেন—আমাদের ভাষায় তাকে আমরা সভা-সমিতি, সংঘ বা ক্লাবও বলতে পারি। এ সম্বন্ধে হের কুনো, ডঃ শুর্জ, হাটন ওয়েবস্টার, রিভার্স, লাউই, ম্যানি-লাউস্কি প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন এবং আমাদের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে কাজ করেছেন ডঃ ভেরিয়ের এলুইন ও ফন হাইমেনডর্ফ, সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন শরৎ রায়, হাটন, মিলস এবং আরও অনেকে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, আদিম মানব-সমাজ কেবল 'পরিবার' ও 'ক্ল্যানে' বিভক্ত নয়, নানা রকমের সভা-সমিতি ও ক্লাবে বিভক্ত। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এবং বয়সের ভিত্তিতে এইসব সভা-সমিতি গড়ে ওঠে। অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের স্বতন্ত্র বাসস্থান আছে। বিবাহিত পরিবার থেকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বালক-বালিকাদের পৃথক করে দেওয়া হয় এবং তারা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে। অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের বাসস্থান Dormitory আলাদা হলেও, প্রায়ই দেখা যায়, তাদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা, নাচ-গান, সামাজিক কাজকর্ম এবং যৌন-বিহার পর্যন্ত চলে। এর ভিতর থেকেই যে যার প্রেমিক-প্রেমিকাকে নির্বাচন করে নেয়, তারপর সেই মুক্তপ্রেমের সম্পর্ক 'বিবাহের বন্ধনে' যখন বাঁধা পড়ে, তখন নবদম্পতী বিবাহিতদের সঙ্গে বাস করতে চলে যায়, সাধারণত 'ডর্মিটোরীতে' থাকার তাদের আর অধিকার থাকে না।

কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের এই যে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ

সামাজিক মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম নাচ-গান, হল্লা এবং তার ভিতর দিয়ে প্রেম ও বিবাহ, একেই আমরা আধুনিক ভাষায় 'ক্লাব লাইফ' বলতে পারি। আমাদের আধুনিক 'ক্লাব-জীবন' এ ছাড়া আর কি? এ কথা আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি। কিন্তু আধুনিক সমাজের ক্লাব-জীবনের সঙ্গে আদিম সমাজের এই 'ক্লাব-জীবনে' ব্যবধান অনেক। প্রথমত আধুনিক ক্লাবের মধ্যে বিবাহিত-অবিবাহিতের কোন বাদ-বিচার নেই, সকলের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা ও যৌন-বিহার পর্যন্ত চলতে পারে। আদিম সমাজে তা চলে না। বিবাহিত জীবনের নিষ্ঠা ও আনুগত্য সেখানে অনেক বেশি। এমন কি অবিবাহিত জীবনের মেলা-মেশার মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, যে যার প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ বিহার করে থাকে এবং প্রত্যেকেই সেই প্রেমের সম্মান করে থাকে। অথচ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে জঘন্য হিংসা, বিদ্বেষ, খুন-খারাবি, বেইমানি, বিশ্বাসঘাতকতা—এসব আমাদের আধুনিক 'সভ্য' সমাজের তুলনায় আদিম সমাজে অনেক কম দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত বিহার উড়িষ্যা হল আদিম মানব-সমাজের এই জাতীয় সংঘ, ক্লাব বা 'ডর্মিটোরীর' স্বর্গরাজ্য। তা ছাড়া বাঙলার প্রতিবেশী আসামের নাগা, খাসি ও গারোদের মধ্যেও তরুণ-তরুণীদের 'ডর্মিটোরী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের ওরাঁও মুণ্ডা বিরহোড় সাঁওতাল জুয়াঙ, ভুঁইয়া খন্দ শবর প্রভৃতি জাতির এই 'ক্লাব'-জীবন তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাঁওতাল ও হো-দের মধ্যে আজকাল আলাদা 'ডর্মিটোরীর' কোন ব্যবস্থা না থাকলেও, এক সময় যে বেশ ছিল তা তাদের সামাজিক মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম ও যৌন-সম্পর্কের ধরন দেখলেই বোঝা যায়। ওরাঁওদের 'ধূমকুড়িয়া', মুণ্ডা ও বিরহোড়দের 'গিতিওড়া', জুয়াঙদের 'দরবার' ও 'ধাঙড়ীবাসা' শুধু যে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের নাচ-গান, মেলা-মেশার কেন্দ্র বা স্বাধীন যৌন-

বিহারের আড্ডাখানা তা নয়, সমস্ত জাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন-কেন্দ্রও বটে। এলুইন সাহেব মারিয়াদের যে 'ঘোটুলের' সুদীর্ঘ ইতিহাস লিখেছেন তাও কেবল 'নাইট ক্লাবের' মতন খানাপিনা-নাচের আড্ডাখানা নয়, সমস্ত জাতির প্রাণকেন্দ্র। আসামী নাগাদের 'মোরুঙ', খাসিয়াদের 'চ্যাঙ' এবং গারোদের 'ডেকা-চ্যাঙ' বা 'নকপান্তেও' ঠিক তাই, সমস্ত নাগা, খাসি ও গারো জাতির জীবনকেন্দ্র, সংস্কৃতি ও কলাকেন্দ্র, কেবল নাচ-গান-পান-মজলিসের আড্ডাখানা নয়, বা আধুনিক 'নাইট ক্লাব' নয়।

আমরা বাঙালীরা সমাজ-জীবনের অনেকাংশে এই আদিম প্রাণবন্ত সংস্কৃতিধারার উত্তরাধিকারী। বাঙালী তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে স্বাধীন মেলা-মেশার ঝোঁক তাই অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা যায়। অনেকে বলেন, সেটা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নয়, সব মানুষের বৈশিষ্ট্য। ঠিক কথা। কিন্তু এ রকম আবেগসর্বস্ব প্রেম, এরকম ব্যর্থ প্রেমের ফলে বৈরাগ্য ও আত্মহত্যার হিড়িক, জানিনা এ দেশের আর কোন জাতের মধ্যে এত বেশি মাত্রায় আছে কিনা। তা ছাড়া, এ রকম আড্ডাবাজ জাত বাঙালীর মতন আর কেউ নেই। কেবল আড্ডা দিয়ে রাজার ছেলে পথের ভিখিরী হয়েছে বাংলাদেশেই। বাঙালী তাই 'চায়ের দোকান' করেছে 'মজলিশ' ও 'গুলটিস' নাম দিয়ে অলি-গলিতে, তবু মুদির দোকান করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসেনি। বাঙালীর এই আদিম অকৃত্রিম প্রাণধারাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু সংস্কৃতির শাস্ত্র-কাররা অনুশাসনের বন্ধনে টুঁটিটিপে মারতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঙালী তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই শাস্ত্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বাঙালীর মানস-বিদ্রোহ "তান্ত্রিকতার" মধ্যে ফুটে উঠেছে, সহজিয়া ও আউল-বাউলের ঢালু পথে পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড তোড়ে ছুটে গেছে। তান্ত্রিক সাধুদের নৈশ পঞ্চমকার সাধনা, আউল-বাউল নেড়া-নেড়ীদের সম্প্রদায়—এগুলো এক ধরনের ক্লাব ও নাইট-ক্লাব ছাড়া আর কি? যে ধর্ম তার শাস্ত্রীয় অনুশাসন দিয়ে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে

চেয়েছে, সেই ধর্মের মধ্যেই আমাদের মুখোসপরা আদিম প্রবৃত্তি তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। অসংখ্য মঠ, আশ্রম আর ধর্মসংঘের মধ্যে আমরা ক্লাব ডর্মিটোরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। 'অন্যায়' ও 'পাপের' গোপন চোরাগলির দিকে তাই আমরা সহজেই আকৃষ্ট হই। এমন কি, ইংরেজরাও আমাদের শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার গণিকালয়ে আমাদের 'ক্লাব' ও 'ডর্মিটোরীর' বাসনা মিটে গেছে। ধনিকদের গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ 'ক্লাব' ও 'নাইট ক্লাব' তার বিকৃত প্রকাশ মাত্র। আদিম সমাজের ডর্মিটোরীর বা ক্লাব সংঘের সেই প্রাণময়তা নেই, তার বদলে আছে আধুনিক ক্লাব-জীবনের নারীপুরুষ সম্পর্কের প্রাণহীন পণ্যময়তা। আদিম সমাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের যে 'মানবিক' সম্পর্ক ছিল, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তাতে নারী 'কমোডিটি' বা পণ্যে পরিণত হয়নি এবং টাকাও সমাজের সর্বাধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মেলা-মেশা, এমন কি সহবাস পর্যন্ত হৃদয়হীন যান্ত্রিক-যৌনবিহারে পরিণত হয়নি। প্রত্যেক আদিম জাতির 'ডর্মিটোরী' তাই সমগ্র জাতির সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের টাকা আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, নেই কেবল প্রাণ ও প্রেম। তাই ক্লাবে ও নাইট ক্লাবে আমরা মদের নেশায় অবসন্ন হয়ে ঢুলি, নারী সাহচর্য টাকা দিয়ে কিনি। নারী আমাদের সখের বস্তু, যেমন কিউরিও কিনি, ছবি কিনি, ঘড়ি কিনি, হীরের আংটি কিনি, তেমনি তাদেরও কিনতে পাই। ক্লাব, নাইট ক্লাবগুলো এই ধরনের কেনা-কাটার বাজার ছাড়া কিছুই নয়। তবু তার মধ্যে যেটুকু বাইরের নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাও বাঙালীর মনকে তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। তাই ক্লাব, নাইট ক্লাবের প্রাধান্য বাঙালী সমাজে নেই। তার বদলে আছে অসংখ্য 'আড্ডা-কেন্দ্র', চায়ের দোকান কেন্দ্র করে, পাড়ায় প্রতিবেশীর বারান্দায় বা খোলা মাঠে, আর নব্য ধনতান্ত্রিক যুগের গণিকালয়ে অথবা নবাবী আমলের ধ্বংসাবশেষ, পুরনো বাগানবাড়িতে।

১২

কর্তামশায়

"বাবু তো বাবু বড়বাবু, আর সব বাবু হাফবাবু"—কথাটা বাবুসমাজে খুব প্রচলিত। তেমনি আমাদের যৌথ পরিবারের কর্তা। কর্তা তো কর্তা যৌথ পরিবারের কর্তা, আর সব কর্তা খণ্ডিত বা কর্তিত কর্তা। সকলেই জানেন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এ-কর্তা যে-সে কর্তা নন। ইনিই সেই যৌথ পরিবারের কর্তা, বড়কর্তা বা কর্তাবাবু বলে যিনি সর্বজন-সম্বোধিত। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই সংসারের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, তা সে যেরকমের কর্মই হোক।

'পরিবার' বলতে মানবসমাজের যে ছোট্ট প্রাথমিক ইউনিটটিকে আমরা জানি, তা কেবল বাপ-মা ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়া পরিবার। সমাজের গোড়ার ইতিহাস এই ধরনের ছোট ছোট পরিবারের ইতিহাস। আধুনিক পরিবারের গড়নও তাই, যদিও তার শ্রী অন্য রকম। যৌথ পরিবার মধ্যযুগের সমাজের সৃষ্টি। যেমন ছিল তখন সমাজের গড়ন, তেমনি ছিল পরিবারের গড়ন। তাই হবার কথা, কারণ পরিবার হল বাইরের বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগের সম্রাট ও বাদশাহদের কথা মনে না করলে, যৌথ পরিবারের

কর্তাদের কথা ভাবা যায় না। এক সম্রাট ও বাদ্‌শাহ, কিন্তু তাঁর পোষ্য কত ? রাণী বেগম দাসদাসী আমলা-অমাত্য-আমীর-উজীর শিল্পী-কারিগর, সব একজনের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজন। তাই নিয়ে মহলের পর মহল-যুক্ত গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ এবং মধ্যযুগের ছোট ছোট কোর্ট-টাউন গড়ে ওঠে। যৌথ পরিবারের কর্তা হলেন এই সম্রাটেরই পকেট-সংস্করণ। বহু পোষ্য তাঁর এবং সব পোষ্যের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপালক। রাজদরবারে সম্রাটের সামনে যেমন সকলে ঘাড় হেঁট করে কুর্নিশ করতে করতে আসে—আমীর উজীর থেকে সাধারণ আমলা পর্যন্ত—যৌথ পরিবারের বড়কর্তার বৈঠকখানাতেও তেমনি সকলে একে-একে বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে আসেন—সহধর্মিণী, সহোদর ভাইবোন, পুত্রকন্যা, মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন, ভাগনে-ভাগনী, ভাইপো-ভাইঝি, সরকার গোমস্তা দাসদাসী সকলে। সম্রাট বসে থাকেন সিংহাসনে, বড়কর্তা বসে থাকেন গড়-গড়ার নলমুখে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সম্রাট হুকুম দেন, বড়কর্তা শুধু হুকুম নয়, তার সঙ্গে হুঙ্কারও দেন, তম্বিগম্বিও করেন। সে-হুঙ্কার সিংহের গর্জনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একেবারে হালের তরুণ যাঁরা তাঁদের হয়ত সে-হুঙ্কার শোনার সুযোগ হয়নি, কারণ তাঁরা সকলেই প্রায় একক পরিবারে মানুষ। তিনের কোঠার প্রান্তে যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁদের অনেকেরই সে-হুঙ্কার শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। 'সৌভাগ্য' ইচ্ছা করেই বলছি, কারণ হুঙ্কার হলেও কর্তাবাবুর হুঙ্কারের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় থ্রিল আছে। বোঝা যায়, কিন্তু বুঝিয়ে বলা যায় না। দিনে অন্তত দুচারবার না শুনলে যেন মনেই হয় না যে বড়কর্তার বটবৃক্ষের ছায়ায় বেশ দিব্যি খেয়েদেয়ে বেঁচে আছি এবং শুয়ে শুয়ে নিষ্ক্রিয়তা-জনিত চোঁয়াঢেকুর ও হাঁই তুলছি। উঠোন, বৈঠকখানা, দরদালান, অন্দরমহল, পূজামণ্ডপ সব যেন তাঁর তম্বিগম্বিতে গমগম করে ওঠে, হুঙ্কারের ঝঙ্কারে চারমহলা বাড়ির খোপ্‌খুপরি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোষা পায়রা উড়ে যায়, কাকাতুয়া ময়না হরবোলা সব একসঙ্গে

শেখানো বুলি বলতে থাকে, পর্যাপ্ত উচ্ছিষ্টভোজী হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের দল হঠাৎ ভয় পেয়ে চারিদিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে, পোষ্যের দল তটস্থ হয়ে যায়, দাসদাসীরা গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়িয়ে হরিনাম জপ করতে থাকে। এক হুঙ্কারে এত কাজ হয়। যার তার হুঙ্কার নয়, যৌথ পরিবারের বড়কর্তার হুঙ্কার।

একেই বলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। হুঙ্কার না দিলেও চলে না, পরিবার অচল হয়ে যায়। কমপক্ষে একপণ অর্থাৎ চারকুড়ি ছোট-বড়-মাঝারি পোষ্যের একান্নভুক্ত বিশাল যৌথপরিবার চালানো কি সহজ ব্যাপার? প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুটি ছোট ভাই, দ্বিতীয় পক্ষের এক পিতৃমাতৃহীন ছোটবোন এবং তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যার এক বৈমাত্রেয় ভাই থেকে আরম্ভ করে, চার সহোদরের চারজন স্ত্রীর চার-পাঁচে কুড়িটি পুত্রকন্যা, দুই বিধবা বোনসহ পাঁচটি ভাগনে-ভাগনী, গুটিকয়েক মামাতো পিসতুতো শ্যালিকা, নিজের তিনপক্ষের মিলিয়ে তিন-ছয় আঠারটি বংশধর, পুত্রবধূ জন সাতেক, নাতি-নাতনী তিন-সাতে একুশ—মোটামুটি এই নিয়ে একটি ক্রমবর্ধমান যৌথপরিবার। এতগুলি সামলাবার জন্য অন্তত জন দশবারো ভৃত্য থাকাও দরকার। সব যোগ করলে এক পণেও কুলোয় না, একশ পূর্ণ হয়ে যায় প্রায়। সারিবদ্ধভাবে সকলকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়ে যদি পরস্পরের সম্বন্ধনির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, তাহলে স্বজনসম্বোধনের ভাষা খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এঁরা সকলে যদি একই ছাদের তলায় বাস করেন, একই রান্নাঘরে রান্না অন্নব্যঞ্জনে প্রতিপালিত হন, এবং একই বড়কর্তার অধীনে থেকে মেজকর্তা, সেজকর্তা, ছোটকর্তা, মেজবৌ, সেজবৌ, ছোটবৌ ইত্যাদি বিভিন্ন র‍্যাঙ্কসুলভ মর্যাদা ও অধিকার দাবি করেন, তাহলে ব্যাপারটা কি হয় ভাবতে পারেন? পাগলাগারদের সমস্ত পাগলকে একটি হলঘরের মধ্যে বন্দী করে দিলে যা হয়, কতকটা তাই। এ-হেন যৌথ পরিবারের সর্বময় বড়কর্তা যিনি, তিনি যদি সম্রাটের মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ না হন, এবং হুকুম ও

হুঙ্কার সমানতালে না দেন, তাহলে পরিবার অচল হয়ে যায়। শোনা যায়, কলকাতা শহরে বাগবাজার অঞ্চলের বিখ্যাত 'হরি ঘোষ' বিগত শতাব্দীর এইরকম একজন যৌথ পরিবারের কর্তা ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে প্রায় শতাধিক পোষ্য সব সময় তাঁর বাড়িতে বাস করত এবং জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মতন প্রসাদ পেত। তাই উত্তর কলকাতার লোকেরা তাঁর বাড়িটিকে বলত 'হরি ঘোষের গোয়াল'। গোয়াল হলেও গরুর পালের রাখাল নন, যৌথ পরিবারের কর্তা। কেবল 'হেঁই হট্' শব্দ করে রাখাল গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রচণ্ড দাপট দাবড়ানি ও হুঙ্কার ভিন্ন যৌথ পরিবারের কর্তা তাঁর বিপুল সংখ্যক পোষ্যদের কণ্ট্রোল করতে পারেন না। তাই বলে তাঁকে কেবল স্বেচ্ছাচারী ডেস্পট্ ভাবলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। মধ্যযুগের সম্রাট যেমন কেবল ডেস্পট্ নন, সদাশয় বা বেনাভলেণ্ট ডেস্পট্, যৌথ পরিবারের কর্তাও ঠিক তাই। যেমন সহজেই তিনি নির্দয় হতে পারেন, তেমনি সহজে তিনি সদয়ও হতে পারেন। 'দয়া' কথাটাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান। "জুতো মেরে গরু দানের" যে চল্‌তি প্রবাদ আছে আমাদের দেশে, আমার মনে হয়, যৌথ পরিবারের এই দয়াময় কর্তাদের বদান্যতা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে।

যৌথ পরিবারের এই স্বর্ণযুগ আজ চলে গেছে এবং তার সঙ্গে কর্তারাও বিদায় নিয়েছেন। দুচারজন যাঁরা এখনও আছেন, তাঁরা পুরনো ভূতের বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন মাত্র। মধ্যযুগের সেই সমাজও নেই, সেই পরিবারও নেই। গোলাভরা ধানের পর্যাপ্ত অন্ন নেই, গোয়ালভরা গরুর অফুরন্ত দুধও নেই, বলদে-টানা সেই ঘানির ঘন তেলও নেই। নীতিশাস্ত্রের নিয়মে আজকাল আর সংসার চলে না। সংসার চলে অর্থশাস্ত্রের জটিল নিয়মে। কোথায় সেই তপস্বিনী গৃহিণীরা, যাঁরা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, কোমর বেঁধে কোঁদল করেও, শোনা যায়, যাঁরা

সুবচনা ও সুখদর্শনা ছিলেন, পাতিব্রত্যের অর্জিত পুণ্যে যাঁরা গান্ধারীর মতন কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত অভিসম্পাত দিতে পারতেন, দময়ন্তীর মতন লম্পট ব্যাধকে ভস্মীভূত করতেন, সাবিত্রীর মতন মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতেন ? তাঁরা সব আজ উপাখ্যানের নায়িকা। এখনকার গৃহিণীরা দশটা-পাঁচটা চাকরি করেন, করতে বাধ্য হন। নিজের পতিপুত্রের তদারক করার অবসরই তাঁদের এত কম, যে পোষ্যপালনের সময়ই তাঁরা পান না। সামর্থ্যও নেই তাঁদের। সবচেয়ে বড় কথা, আজ তাঁরা পুরুষের অনুগ্রহজীবী নন। আজ তাঁরা আত্মমর্যাদা-ও-সত্তা-সচেতন নারী। নারীর নারীত্ব নিয়েও তাঁরা 'মানুষ'। এমনকি, শিশু ও কিশোররাও আজ স্বতন্ত্র মানুষ—বেত্র-তাড়িত অসহায় জীব নয়। বর্তমান যুগকে তাই সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন—দি সেঞ্চুরি অফ্ দি চাইল্ড। শিশুদের ও তরুণদের বিদ্রোহের যুগ। প্রত্যেকটি মানুষ আজ স্বতন্ত্র অধিকার ও সত্তা-বিশিষ্ট মানুষ। যৌথ পরিবারের কর্তার সর্বময় সত্তার মধ্যে সকলের সত্তা আজ বিলীন নয়। তাই হুঙ্কারে আজ আর কাজ হয় না। যৌথ পরিবারের তুপাশের তুটি স্তম্ভই আছ ভেঙে পড়েছে, একটি পুরুষের অনুগ্রহজীবী নারীর স্তম্ভ, আর একটি অসহায় বালকবালিকার স্তম্ভ। অনেকদিন ধরে তাতেও ভাঙন ধরেছে।

সমাজের গড়ন আজ আর মধ্যযুগের মতন স্থিতিশীল নয়। বিশাল একটি চারমহলা বাড়িতে, একই স্থানে, প্রচুর নিষ্কর্মা পোষ্যসহ পাঁচপুরুষ ধরে বাস করার পরিকল্পনা করা তখনই সম্ভব ছিল, যখন স্থাবর চাষের জমির সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ছিল, কুটীরশিল্পের পণ্যেই জীবনের বাঁধাধরা প্রয়োজন মিটে যেত, বিশেষ নড়েচড়ে বেড়াতে হত না কাউকে এবং চলাচলের সুবিধাও ছিল না। এখন সেই স্থাবর জমির সঙ্গে জঙ্গম জীবনের কোন যোগ নেই, গৃহশিল্পের যুগও নেই। যন্ত্রশিল্পের যুগ, শিল্পনগর ও শহরের যুগ। চাকরির তাগিদে, কাজের প্রয়োজনে, আজ স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে বেড়াতে

হয়। সচল সমাজের অচল যৌথ পরিবারের মিশরীয় পিরামিড তাই গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। সমাজের ও জীবনের সচলতা আজ এত বেশি যে নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপমায়ের যে একক ক্ষুদ্র পরিবার, তাতেও ভাঙন ধরে। সাবালক পুত্র কর্মজীবনের গোড়াতেই হয়ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে যায়। পুত্রের স্বতন্ত্র পরিবার সেখানে গড়ে ওঠে। কন্যাদেরও প্রায় তাই হয়। দুএকটি নাবালক সন্তান নিয়ে বাপমায়ের পরিবারটি থাকে শুধু। মনে হয়, পরিবার যেন ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। তাই হবার কথা অবশ্য। সমাজ যত সচল ও সক্রিয় হবে, পরিবার তত সঙ্কুচিত হবে। পরিবারে যা কাজ ছিল, যা দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, ক্রমে তা বাইরের সমাজ ও রাষ্ট্র করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। এমনকি শিশুপালন ও বৃদ্ধপোষণ পর্যন্ত। যৌথ পরিবারের কর্তা তাই বাইরের গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

১৩

ধরণীর এক কোণে

ধরণীর এককোণে, আপন মনে, পরম নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্য ছোট্ট একটি বাসা বাঁধার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পাখিরা নীড় বাঁধে, মৌমাছিরা বাঁধে মৌচাক। উইপোকারাও মাটির ঢিবি তৈরি করে। সকলের শ্রেষ্ঠ মানুষ যে গৃহনির্মাণ করার স্বপ্ন দেখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! ঘর যাদের নেই এবং ঘর বাঁধার কোন সুদূর সম্ভাবনাও নেই কোনদিন, তাদের যখন এই কলকাতার মতন শহরের আনাচে-কানাচে ও ফুটপাথে বেওয়ারিশ আবর্জনা কাঠকুটো ন্যাকড়াকানি-চাটাই দিয়ে ঘর বেঁধে বাস করতে দেখা যায়, তখন মনে হয়—সত্যিই মানুষের প্রাণ কতখানি গৃহগত! তখন মনে হয়, বাবুই পাখির চেয়ে গৃহনির্মাণে মানুষ কম কুশলী কিসে? কলকাতা শহরে একদিন এই রকম এক ঘর-বাঁধা দেখতে দেখতে আমার প্রতি-বেশী হরিদাসদার গৃহনির্মাণের কথা মনে পড়ছিল। বাবুই পাখি মুখে করে একটি একটি করে খড় যুগিয়ে যেমন বাসা বাঁধে, হরি-দাসদাও তেমনি বহুকাল ধরে ইঁট সুরকি চূণ বালি সিমেন্ট লোহালক্কড় সব যোগাড় করে গৃহনির্মাণ শুরু করেছিলেন। হরিদাসদা একটু

কাব্যিক প্রকৃতির, বৌদি হিসেবী। তার উপর বৌদির 'গুছিয়ে-নেওয়ার' বাতিকটাও বেশ উগ্র। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়স্বজনরা সকলেই যে-যার বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে, কেবল তাঁরই সব অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী নরেনবাবু সামান্য একজন মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী, তিনিও টালিগঞ্জে নতুন গৃহনির্মাণ করে সেদিন উঠে গেলেন। বৌদির একজন ভগিনীপতি, সাধারণ স্কুল মাস্টার, তিনিও তো ঢাকুরিয়ায় গৃহনির্মাণ শুরু করেছেন। এই তো সেদিন কসবায় জমি কিনে এলেন কেনারামবাবু, মাত্র শ'আড়াই টাকা মাইনেতে আড়াই গণ্ডা পুষ্যি প্রতিপালন করেও। আর হরিদাসদা? পরম নিশ্চিন্তে ভাড়াটিয়া বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। জানলার কব্‌জা ভাঙা, দরজার খিল নেই, দেয়ালের চূণবালির চাপড়া ধসে পড়ছে, ছাদ ফুটো, বৃষ্টি হলে ছাতি মাথায় দিয়ে ঘরের মেজেয় বসে থাকতে হয়, তাতেও তাঁর সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হয় না। বৌদি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, হরিদাসদা তখন ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে আবৃত্তি করতে থাকেন—

ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ি!
তোমারও বন্ধু দেখিতেছি প্রায় আমারই মতন হায়া,
হাড়ে যত লাগে মরণের ঘূণ, বাড়ে চামড়ার মায়া!
জর্জর বুক ভরে আসে যত ভাড়াটে স্মৃতির ভারে,
অনাগত নব ভাড়াটের আশে জাগে সে অন্ধকারে!

কথায় কথায় কবিতা আওড়ে দিন অবশ্য কাটল না। শেষ পর্যন্ত পাড়ার আরও দুচারজন প্রতিবেশীর মতন হরিদাসদাকে গৃহনির্মাণের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করতে হল। হরিদাসদা ইতিমধ্যে গ্রেডান্তরিত হলেন। ছিলেন ৯০—৬—১৫০—১০—২৫০-র গ্রেডে, উঠলেন ১২০—৮—২০০—১২—২৬০—২০—৩৬০-এর গ্রেডে। মধ্যবিত্ত জীবনে গ্রেডান্তরই জন্মান্তরের সামিল। সুতরাং দাদার গ্রেডান্তরিত হবার

পর বৌদির নতুন গৃহে স্থানান্তরিত হবার বাসনা উগ্রতর হয়ে উঠল। অবশেষে হরিদাসদাকেও আত্মসমর্পণ করতে হল—গীতিকাব্যের বেদেনীর কাছে নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের গৃহিণীর কাছে। ঠিক হল, গৃহনির্মাণ শুরু হবে।

কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় একখণ্ড বাস্তুজমি কিনলেন হরিদাসদা। জমি কেনার পর থেকে নিয়মিত বৈঠক বসতে লাগল আমার বাড়িতে। গৃহের প্ল্যান নিয়ে কত যে জল্পনা-কল্পনা হল তার ঠিক নেই। দেড়গজ ছাঁট কাপড়ে কর্তাগিন্নী-ছেলেপিলের 'ওভারকোট' তৈরির প্ল্যানের মতন। 'গেস্ট রুম', 'স্টাডি' ও 'বাথরুমের' উপর দাদা যত জোর দেন, বৌদি তত 'কিচেন' আর 'স্টোর' নিয়ে তর্কাতর্কি করেন। দাদার 'স্টাডি' আর বৌদির 'স্টোরের' মধ্যে পড়ে আমার প্রাণ একএকদিন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। ভিৎপত্তনের আগে গৃহের প্ল্যান নিয়ে প্রায় গৃহবিবাদের উপক্রম হল।

শুভদিনে বাস্তুদেবতা ও গৃহদেবতার পুজো দিয়ে, গৃহের ভিৎপত্তন করা হল যেদিন, হরিদাসদা সেদিন আমার বাড়ি এসে বললেন—বুঝলে ভাই, হোম্ সুইট হোম, দেয়ার্স নো প্লেস লাইক হোম্! বেহালার হোম যখন তৈরি হবে তখন দেখো, হোম্ কাকে বলে।

গৃহের ভিৎপত্তনের পর, কি করে যেন মৈত্রমশায়ের সাগরসঙ্গমে যাবার মতন হরিদাসদার গৃহনির্মাণের বারতাটা 'গ্রামে গ্রামে রটি গেল ক্রমে'। অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, উভয়পক্ষের, দাদার ও বৌদির, যে যেখানে ছিলেন, সকলেই পথেঘাটে বাজারে বাসেট্রামে অফিসে, কেউ কেউ বাড়িতে এসে পর্যন্ত বলে গেলেন—কাজের মতন কাজ করছে হরিদাস, ইহকাল এবং পরকালের কাজ। অযাচিত উপদেশের ভিড় আরও দ্রুত জমতে লাগল, ভিটেয় দুগাড়ি ইট পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে। এ ইট নয়, অমুকের ইট ভাল—এ-ইঁটে বালির ভাগ বেশি ইত্যাদি। 'বাড়ি যখন করছ, হরিদাস, তখন ভাল করেই করো, দুচার পুরুষ ভোগ করা যায়, এমনি করে।' এরকম আরও অনেক

উপদেশ। হরিদাসদা বললেন : 'ইট আসতেই এই অবস্থা, দেয়াল গাঁথা আরম্ভ হলে যে কি হবে, তাই ভাবছি! উপদেশের ধাক্কায় না দেয়াল ধূলিসাৎ হয়ে যায়!'

তা অবশ্য হল না। হবার আগেই দেয়াল নিয়ে এক ঘোর সঙ্কট দেখা দিল। ইঞ্চি দুয়েক দেয়াল উঠেছে, এমন সময় ঝড় উঠল, বাইরে নয়, ঘরে। কালবৈশাখী ঝড়। প্রতিবেশী আমি, একদিন তার গুরুগুরু গর্জনে চমকে উঠলাম। হল কি? রাত তখন প্রায় এক প্রহর। দাদা হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললাম—'হল কি, হরিদাসদা?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদা বললেন : 'পাঁচ ইঞ্চিতে হবে না।' বলতে বলতে দেখি স্বয়ং বৌদি এসে হাজির। অত্যন্ত উত্তেজিত। দাদার কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন : 'ও বাড়িতে আর যেই বাস করুক, আমি অন্তত করব না।' বলেই তিনি দ্রুত অন্তর্ধান করলেন। দাদা বললেন : 'বুঝলে তো? পাঁচ ইঞ্চির ঠেলা সামলাতেই প্রাণ যায়, তার ওপর আবার দশ ইঞ্চি!'

বুঝলাম—দেয়ালের প্রস্থ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। বৌদির ইচ্ছা, দোতলার ভিতের উপর দশ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে একতলা হোক, কারণ চিরকাল যে তাঁরা একতলাতেই বাস করবেন এমন কোন কথা নেই। দোতলাতে অন্তত একখানা ঘর তৈরি করেও তিনি বাস করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। দাদারও যে ইচ্ছা নেই তা নয়। চাকরি-জীবনে গ্রেডান্তরের মতন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 'তলান্তরিত' হবার ইচ্ছা মধ্যবিত্তের মধ্যে যে কত প্রবল তা একমাত্র মধ্যবিত্তরাই জানেন।

অবশেষে দশ ইঞ্চি দেয়ালই সাব্যস্ত হল। দীর্ঘ দুবছর ধরে ধীরেসুস্থে কোনরকমে ঠেলে উঠল দেয়াল। ঠেলে তোলা কি সহজ? চাকরিতে গ্রেডান্তরিত হয়েও হরিদাসদার সাধ্য কি—দশ ইঞ্চি দেয়াল গেঁথে, সিঁড়ি দিয়ে বৌদিকে দোতলার ঘর পর্যন্ত ঠেলে

তোলেন ? অফিসের কো-অপারেটিভের ঋণ, ইন্‌সিওরেন্সের ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও পুঁজি, বৌদির গহনাগাটি, সমস্ত ইন্‌ভেস্ট করার পরেও তিন বছরে যাবতীয় দেয়ালের কাজ শুধু শেষ হয়েছে। বাকি আছে অন্য সব—ছাদ, দরজাজানলা, দেয়ালের বালি, মেজের সিমেণ্ট ইত্যাদি। হরিদাসদার লক্ষ্য হল—প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় দরজাজানলা ছাদ ও অন্তত একখানা ঘরের চূণবালি সিমেণ্টের কাজ শেষ করে, ভাড়াটে বাড়ি ত্যাগ করা। তারপর ধীরেসুস্থে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ শেষ করা—মায় বৌদির দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত।

কিন্তু দাদা ভাবেন এক, বৌদি ভাবেন আর-এক, এবং উপর থেকে সালিশী করে ভগবান সব লণ্ডভণ্ড করে দেন। এর মধ্যে হরিদাসদার গৃহ নিয়ে আরও অনেক ঝঞ্ঝাট বেধে গেল। দশ-বাই-দশ দুখানি ঘর, তৎসংলগ্ন বারান্দাসহ যখন গাঁথা শেষ হল, তখন বৌদি একদিন দেখতে এসে বলে গেলেন, 'এর চেয়ে গরুর খোঁয়াড় অনেক ভাল।' মাতৃতুল্য মাসীমা একদিন ঘর দেখতে এসে বললেন—'পায়রার খোপ্ তৈরি করেছিস কেন ? ঠাকুরঘর কই ? অমন কাজ করিস নে হরিদাস, দোতলায় একখানা ছোট ঠাকুরঘর তৈরি কর্।' হরিদাসদা বললেন : 'ঠাকুর তো এতদিন দেয়ালেই ঝুলতেন মাসীমা, হঠাৎ এখন দোতলার ঘরে রাখতে বলছ কেন ? আর দোতলায় ঘর যদিও বা একটা ছোট্ট জোড়াতালি দিয়ে করা যায়, সিঁড়ি করতে তো অনেক দেরি হবে।' মাসীমা খুশি হলেন না কথা শুনে এবং অখুশি ভাবটা বৌমাকেও জানিয়ে গেলেন। একদিন এক পিসতুতো বোন এসে বাড়ি দেখে বলে গেল—'আমরা যে এসে দুএকদিন থাকব মধ্যেসধ্যে, তার কোন উপায় নেই। এমন বাড়ি না করলেই পারতে ! অন্তত বারান্দাটা ঘিরে নিও দাদা !' এ-সব তো তবু ভাল ! এরমধ্যে একদিন মারাত্মক কাণ্ড বেঁধে গেল, সামান্য তাকের ব্যাপার নিয়ে। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল তৈরি হবার পর বৌদি দেখে বললেন—

'দেয়ালের তাক চওড়া হয়নি, কোট-বাটা ধরবে না, সংখ্যাও খুব কম হয়েছে—ওতে চলবে না।' অতএব ভাঁড়ারের দেয়াল আবার ভেঙে তৈরি করতে হবে।

এদিকে ষষ্ঠবর্ষ প্রায় হতে চলল। এখনও দরজা জানালা ছাদ, সবই বাকি। অর্থের ভাণ্ডারও শূন্য। প্রেতান্তরিত হরিদাসদা নিচের তলাতেই প্রায় সমাধিস্থ হবার উপক্রম! দশ ইঞ্চি দেয়ালের চাপে, মনে হয় যেন তিনি ধুঁকছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'শুভদিনে গৃহের ভিৎপত্তন করেও, কে জানত, এরকম দুর্দিনের গোড়াপত্তন হবে? তবু নিশ্চিত জেনো, একবার যখন শুরু করেছি, তখন এর শেষ কোথায় দেখে নেব। ভাঁড়ার ঘরে চারদেয়ালে চার-বারং আটচল্লিশটা চওড়া-চওড়া তাক লাগিয়ে, তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করে, তোমার বৌদিকে অন্তত দোতলার চিলেকোঠা পর্যন্ত ঠেলে তুলবই। যেদিন তা পারব সেদিন আমার গৃহনির্মাণ শেষ হবে'—'এবং' আমি বললাম, 'গৃহিণীও খুশি হবেন।'

১৪

জীবনের দৌড়

আজকাল সকলেই বলেন, দিনকাল বদলে গেছে। বাস্তবিক এত দ্রুত বদলে গেছে যে, আমরা তার সঙ্গে যেন তাল রাখতে পারছি না। যত দিন যাচ্ছে তত পরিবর্তনের গতি বাড়ছে। পরিবর্তনের নিয়মই তাই। ক্রমে তার ছন্দ বদলায়, তাল বদলায়। একশ' বা এক হাজার বছর আগেও সমাজ পরিবর্তনশীল ছিল কিন্তু তার গতির ছন্দ ছিল অন্য রকম। ঢিমে তালে তখন পরিবর্তন হত এবং ধীরেসুস্থে আমরা তার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিতাম। এখন এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, অনেক সময় তার ধাক্কায় আমরা জীবনের স্বাভাবিক চলার পথ থেকে, আশপাশে ছিট্‌কে পড়ছি। আমাদের এই পরিবর্তনের গতির সঙ্গে একশ' বছরের এক বৃদ্ধের জীবনের তুলনা করে একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন—৮৫ বছর আমাদের কিন্দারগার্টেনে কেটেছে, ১০ বছর কেটেছে প্রাইমারী স্কুলে, আর বাকি ৫ বছর মিডল্‌ ও হাইস্কুল শেষ করে আমরা কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে গেছি। চলার ভাষায় বলা যায়—৮৫ বছর আমরা কেবল হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, ১০ বছর চলেছি থপ্‌ থপ্‌ করে, আর বাকি ৫ বছর দৌড়েছি

ঘোড়দৌড়ের মতন পড়িমরি করে। আমাদের এই এগিয়ে চলার কাহিনীই হল এযুগের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রূপকথা।

এগিয়ে চলা প্রসঙ্গে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন পথে তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বললেন—হে রোহিত! যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে—অতএব এগিয়ে চলো! ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই ত্রেতা, আর এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো! দেবরাজ ইন্দ্রের ভাষায়, আমরাই সেই সত্যযুগের মানুষ, এগিয়ে চলাই যাদের ধর্ম। বৈদিক যুগের কোন ঋষি বা রাজপুত্র আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমাদের এগিয়ে চলার বৈদ্যুতিক গতি দেখে নিশ্চয় তিনি শিউরে উঠতেন। দেখতেন, তাঁদের সেই আশ্রম ও তপোবনের জীবন, সেই সহজ সরল গ্রাম্যজীবন, সেই পৌর বা নাগরিক জীবনের কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে! কলকারখানা যন্ত্রপাতি যানবাহন রেডিও-টেলিফোন ইত্যাদি দেখে অবাক হতেন হয়ত, কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন লোকসংখ্যা দেখে, লোকের ভিড় দেখে। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের জনস্রোতের সামনে দাঁড়ালেই ভয়ে তাঁরা আড়ষ্ট হয়ে যেতেন।

আগের তুলনায় লোকসংখ্যা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে, জীবনযাত্রার মান ও ধারাও আমূল বদলে গেছে। নগর ও শহর হয়েছে কর্মজীবনের উৎস। শহুরে জীবনযাত্রার স্রোত শতধারায় প্রবাহিত হয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে পৌঁছচ্ছে এবং গ্রাম্যজীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে দিচ্ছে। আগে নগর ছিল গ্রামনির্ভর, এখন গ্রামও নগরনির্ভর হয়ে উঠেছে। কে কার উপর বেশি নির্ভর করে বলা কঠিন। গ্রামে

হয়ত শহরের মতন রাস্তাঘাট নেই, ঘরবাড়ি নেই, ট্রাম-বাস টেলিফোন নেই। বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের পার্থক্য আজও গ্রাম ও শহরের মধ্যে যথেষ্ট আছে। কিন্তু মূল অর্থনৈতিক জীবনের ব্যবধান—গ্রামের সঙ্গে শহরের—ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে। একঘেয়ে নাগরিক জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে আগে যেমন আমরা গ্রামের সুলভ ও সাবলীল জীবনযাত্রার দিকে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম, আজকাল আর তা ফেলতে পারি না। মূল্য ও গুণাগুণ কোনদিক থেকেই আজ গ্রাম্য খাদ্য বা পণ্যের সঙ্গে শহরের তফাৎ নেই। সব সমান হয়ে যাচ্ছে। কারণ গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতির জন্য, তা আর থাকছে না। শুধু তাই নয়, রেডিও ও সংবাদ-পত্র মারফৎ শহরের সব খবর, বাজার দর পর্যন্ত গ্রামে পৌঁছচ্ছে। আগেকার আত্মকেন্দ্রিক গ্রামের যে একটা স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার মান ছিল, তা আর এখন থাকছে না। কি করে থাকবে ? যুগটা হল কমেটের যুগ, গো-গাড়ি বা ছ্যাক্‌রা-গাড়ির যুগ নয়।

এই বিশাল পৃথিবীটা যখন কমেটের কল্যাণে ক্রমে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে, তখন গ্রাম্য ও শহুরে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বজায় থাকবে কেমন করে ? থাকা সম্ভব নয়, থাকছেও না। তার ফলে সমাজের গড়নও বদলে যাচ্ছে। কুলকৌলীন্যর বদলে অর্থকৌলীন্য আজ সেকালের সমাজের অচল গড়ন ভেঙে দিচ্ছে। সমাজ আজ বিত্তকেন্দ্রিক, কুলকেন্দ্রিক নয়। বিত্তকেন্দ্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানও বিভিন্ন। বিত্তোপার্জনের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনুযায়ী প্রত্যেক স্তরের মধ্যেও আবার নিয়ত ভাঙাগড়া চলছে। যেমন মধ্যবিত্তের মধ্যে। মধ্যস্তর থেকে মধ্যবিত্তের একটা অংশ যেমন উঁচুতে উঠছেন, তেমনি অন্য একটা অংশ আবার নিচুতে নামছেন। এই ওঠানামা অনবরত চলছে। এ যুগের পরিবর্তনশীল সমাজের এইটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রেণীর স্থিতি নেই, স্তরের

স্থিতি নেই—সুতরাং জীবনযাত্রার মানেরও স্থিতি নেই। খাপ-খাওয়ানোর ক্ষমতা বা 'adaptability', সবচেয়ে বড় জৈবিক সত্য, জীববিজ্ঞানীরা বলেন—তার জন্যই জীবজগতের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। সামাজিক সত্যও তাই, বিশেষ করে আজকের এই পরিবর্তনের যুগে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য।

কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও জীবনযাত্রার মান জড়িত। জীবনযাত্রার তাগিদে ঘরের মেয়েরা আজ বাইরে কাজ করতে বেরিয়েছেন। তার জন্য পারিবারিক জীবনে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেষ্টার মতন 'পুরাতন ভৃত্যরা' আজ কলকারখানার স্বাধীন মজুর, গৃহবন্দী দাস নয়। ভৃত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং ঘরে-ঘরে ভৃত্য-সঙ্কট। ঘরণীরও নানারকম সমস্যা—রন্ধনের সমস্যা, শিশু-পালনের সমস্যা। যৌথপরিবারের যুগের দুএকজন অনাথা পিসিমা বা 'সারপ্লাস্' ভাইপো-ভাগ্নেও নেই যে কোনরকমে কাজ চলে যাবে। এককথায় সংসার অচল, এদিকে না বেরুলেও চলে না। অর্থাৎ শুধু সঙ্কট নয়, উভয়সঙ্কট। এই অবস্থায় জীবনের তরি প্রায় ভরাডুবি হবার উপক্রম। অথচ পরিত্রাণের পথ আছে। শুধু বাইরে নয়, ঘরে-বাইরে দু' জায়গাতেই জীবনযাত্রার মান বদলানোর দরকার। পারিবারিক জীবনকে পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়া প্রয়োজন। মধ্যযুগের ঘরে বাস করলাম আর আধুনিক আফিসে কাজ করলাম—স্বামীস্ত্রী, ভাইবোন সকলে—তাতে সংসার তো বটেই, জীবন পর্যন্ত অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ঘরও যদি আধুনিক ঘর হয়, তাতে যদি আধুনিক বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম থাকে—রান্নাঘর থেকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত—ঘরোয়া জীবনযাত্রা যদি আমিরী চালের না হয়, তাহলে পুরাতন ভৃত্য কেষ্টাকে আমরা স্বচ্ছন্দে বিদায় দিয়ে অনেকটা আত্মনির্ভর হতে পারি। পাড়ায় পাড়ায় কিন্দারগার্টেন, নার্সারী

থাকলে শিশুপালনের সমস্যাও কিছুটা মিটতে পারে। এইভাবে ঘরের সঙ্গে বাইরের জীবনযাত্রার বিরোধের অবসান করা যায় এবং করাও বাঞ্ছনীয়। তা না হলে প্রথমে বিরোধ, তারপর সঙ্কট এবং অবশেষে অধঃপতন ও ভাঙন।

ব্যক্তিগত জীবনেও তাই। সঙ্কট সেখানে আরও গভীর। জীবন-যাত্রার ধরনই এমন হয়েছে যে, ক্রমেই আমরা চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক আমরা একসঙ্গে চলাফেরা করেছি, কাজকর্ম করছি, বড় বড় ম্যানসনের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করছি, হয়ত একই সিঁড়ি দিয়ে অসংখ্যবার ওঠানামা করছি—তবু কেউ কাউকে আমরা বিশেষ চিনি না, জানি না, কারও সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই আমাদের। মানবিকতা, সামাজিকতা, আন্তরিকতা, এসব যেন ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, মানুষ যত বাড়ছে, মনুষ্যত্ব তত কমছে। ফাইল-রেকর্ড, ডকুমণ্টে-ডীড, বণ্ডচেক্, মর্টগেজ-কণ্ট্রাক্ট, প্রসপেক্টাস-ক্যাটলগ, সুভেনির-সার্টিফিকেট, বিজ্ঞাপন-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে বিচিত্র এক কাগজের কৃত্রিম জীবন যাপন করছি আমরা। প্রত্যেকে আমরা কাগজের ফুল, বর্ণের বাহার আছে বাইরে, ভিতরে মনুষ্যত্বের গন্ধ নেই। কে যেন বলেছিলেন, দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেল, তাহলে যত তাড়াতাড়ি এসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, কোন ভূমিকম্পে বা মহাযুদ্ধে তা হবে না। কথাটা অনেকটা ঠিক। কাগজ ও সেলুলয়েডের সভ্যতা গড়েছি আমরা, জীবনযাত্রার মানদণ্ডও তৈরি করেছি তাই দিয়ে। একটা 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' জীবনের মানদণ্ড। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই কোথাও, সবুজের চিহ্ন নেই জীবনে। স্তূপাকার ইস্পাত-এলুমিনিয়াম-কংক্রীটের মধ্যে একটুকরো কলে-ছাঁটা লন্ বা পার্ক, নগরবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ডের ভাষায়, ময়লা একখানা পকেট-রুমালের মতন বিসদৃশ। তার মধ্যে আমরা বাস করি, কাছাকাছি থাকি, পাশাপাশি চলি, অজ্ঞাতকুলশীলের মতন। এই অজ্ঞাতকুলশীলতাই, সমাজ-

বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের যাবতীয় মানসিক বিকারব্যাধি, উন্মার্গগামিতা ও অপরাধপ্রবণতার কারণ। আধুনিক পরিবর্তনের যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সঙ্কটই সবচেয়ে করুণ ও মর্মান্তিক।

এখানেও সেই সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রশ্ন—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির। সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সমীকরণ প্রয়োজন। দুয়ের মানদণ্ড এক হওয়া দরকার—সমষ্টির ও ব্যক্তির। তাহলে, এই বিদ্যুৎগতি পরিবর্তনের যুগে, আমরা অনেকটা আমাদের 'ব্যালান্স' রেখে চলতে পারব। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনও ফিরে আসবে।

১৫

প্রথম জীবিকা

জীবনটা নাটক কি না জানি না। তবে সকলের জীবন সম্পূর্ণ নাটক নয়। জীবনের কিছুটা নাটক, কিছুটা নভেল, কিছুটা কাব্য। বাল্যকাল থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্যন্ত জীবনটাকে এই তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। বাকি জীবনটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। 'জীব' থেকে 'জীবন' ও 'জীবিকা' ছুটি কথারই উৎপত্তি হয়েছে এবং ছুয়ের সম্পর্কের মধ্যে বোধ হয় বিপত্তির কারণও তাই। জীবের সঙ্গে জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক কি, তাই নিয়ে অনেক-দিন ভেবেছি, কিন্তু ভেবে কোন কূল পাইনি। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি, অর্থাৎ জীবিকার সংস্থান করবেন তিনি। সেই ভরসাতে অনেকদিন কাটিয়ে প্রায় ভরাডুবি হতে চলেছিলাম। আমার প্রথম জীবিকার করুণ কাহিনী শুনলেই সেকথা বুঝতে পারবেন।

জীবনের এমন একদিন ছিল যখন মাটিতে পা দিতেই হত না। পরিবারের লোকজনের কোলেপিঠে ঘুরে-ঘুরেই দিন কাটত। স্নেহের

প্রতিমূর্তি আত্মীয়-স্বজনরা তখন হাতে নাড়ু নিয়ে মুখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতেন—

হাত ঘুরু ঘুরু নাড়ু দেব
নইলে নাড়ু কোথায় পাব—

সেটা হল জীবনের নাড়ুগোপাল অবতারের যুগ। আর একটু বয়স বাড়তে দেখলাম, নাড়ুগোপালী জীবনের নাড়ুটি খসে গেল, বাকি রইল 'গোপাল'। তাও কম নয়, তখনও সকলের কাছে 'আদুরে গোপাল'। সোহাগের রামধনু রঙ জীবনের আকাশ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তারপর ছাত্রজীবন। পরিবার ও দৈনন্দিন সংসার থেকে দূরে কচি-কচি কল্পনার প্রবালদ্বীপে নির্বাসিত এক বিচিত্র জীবন। জানতাম না, আদুরে গোপালের অন্তিমকাল সেটা। ভেবেছিলাম জীবনটা এমনি করেই বুঝি কেটে যাবে—একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে—আই-এ, বি-এ, এম-এ। কিন্তু তা কাটল না। শেষ পরীক্ষার পর একমাস দুমাস করে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। ফাটকা বাজারের শেয়ারের মতন এম-এ ডিগ্রীধারীর দর হু হু করে নামতে লাগল। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও জীবনের এই তেজীমন্দির মাহাত্ম্য এতদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। নাড়ুগোপালের কাল যে কবে কেটে গেছে, কালিদাসের কালের মতন, তাও খেয়াল ছিল না যেন। অবশ্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর হঠাৎ একটা সোনার চাঁদের স্বর্ণযুগ এসেছিল, কিন্তু সেটা যে এত ক্ষণস্থায়ী তা কল্পনা করতে পারিনি। সোনার চাঁদের নানারঙের দিনগুলি শেষ পর্যন্ত সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে রইল না। বাবা তো একরকম বাক্যালাপই বন্ধ করে দিলেন। মুখোমুখি দেখা হলেই মুখ গম্ভীর করে থাকতেন, কথা বলতেন না। সে-গাম্ভীর্য দেখলে ভয় করত, মনে হত, এর চেয়ে চিৎকার করাও ভাল। মধ্যে মধ্যে শুনতে পেতাম, মা'কে তিনি বলছেন ঃ "ওকে বলে দিও নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে—এটা হরিঘোষের গোয়াল নয়।" বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে

ভাবতাম—কোথায় নাড়ুগোপালের সেই মথুরা-বৃন্দাবন আর কোথায় হরিঘোষের গোয়াল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াও আরম্ভ হল। প্রথমে দেখলাম, খাদ্যের আইটেম্ কমতে লাগল। সকালে একবারের বেশি দুবার আর চা পাওয়া যায় না। মা-পিসিমা কেউ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন না, কি দরকার না দরকার। মাছের টুকরো ছোট হতে হতে প্রায় কাঁটা-সর্বস্ব হয়ে দাঁড়াল। খাবার শেষে একটু দই খেতাম, আবাল্য অভ্যাস, সেটাও ছাঁটাই হয়ে গেল। বড়ভাই হিসেবে ছোট ভাই-বোনদের কাছে আমার খাতির ছিল রামচন্দ্রের মতন। তাও দ্রুত উবে যেতে লাগল। এমন কি, সেইসব দরিদ্র অসহায় আত্মীয়—'the most irrelevant thing in nature'—যাদের দরজার কড়া-নাড়া শুনেই চেনা যায়—মনে হয় এই রেঃ! ঐ এসেছে!—'a Lazarus at your door'—তারা পর্যন্ত দেখা হলে চিনতে পারত না। টাকার মতন মানুষের জীবনেরও যে এরকম ডিভ্যালুয়েশন হয় তা জানা ছিল না, অথচ ডিভ্যালুয়েশনের কত থিয়োরীই না ছাত্রজীবনে মুখস্থ করেছি।

পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে ডিভ্যালুয়েশনের ঢেউ বাইরেও পৌঁছতে লাগল। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, সকলেই যেন কেমন উদাসীন হয়ে উঠল আমার সম্পর্কে। ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, চায়ের আড্ডা, সব জায়গায় আমার উপস্থিতিটাও যেন অন্যের কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। কোথাও আমি কিছুই কন্ট্রিবিউট করতে পারি না। সুতরাং সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, কমিটি-মেম্বার থেকে অর্ডিনারী মেম্বার হয়ে, অবশেষে সেখান থেকেও পদচ্যুত হলাম। ছেলেবেলার সেই "সেণ্টার ফরোয়ার্ডের" কাহিনী মনে হল। ফুটবলম্যাচ খেলার সময় আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, খেলার 'চান্স্' পাওয়ার জন্য। টস্ করে প্লেয়ার নির্বাচন করা হত। একজন প্লেয়ার শুধু আগে থেকেই

ঠিক থাকত, সেণ্টার ফরোয়ার্ড। একদিন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম : "আচ্ছা, সেণ্টার ফরোয়ার্ড বদলায় না কেন?" বন্ধুটি আমার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে বলল : "তাও জানিস্ না, বল্‌টা যে ওর!" সত্যিই জানতাম না যে এই দুনিয়ায় বল্ যার, তার হাত-পা ছোড়ার গুণ ছাড়া আর অন্য কোন গুণ না থাকলেও, সে-ই সব সময় সর্বত্র সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলে। সংসারে টাকার মতন রোলিং বল্ আর কি আছে বলুন?

অবশেষে জীবিকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলাম, জীবনের প্রথম জীবিকা। একদিস্তে কাগজ কিনে নিয়ে এসে লিখতে বসলাম ঘরে। মনটা কারও ওপর প্রসন্ন নয়। নিজের মনে লিখছি আর কবিতা আওড়াচ্ছি—

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া…
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কাব্যপাঠ শুনে মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, ছেলের ভাবান্তর হল কি না। কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে পিসিমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে কি তোর, কি করছিস কি?" গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলাম—"কিছু হয়নি, দরখাস্ত করছি।" "কিসের দরখাস্ত?" "চাকরির দরখাস্ত"। 'ও'—বলে একগাল হেসে পিসিমা চলে গেলেন। একটু পরেই ঘুরে এসে হাসতে হাসতে বললেন : "একটু চা-খাবার খাবি বাবা, এনে দেব?" সম্বোধন ও প্রস্তাব, দুইই অপ্রত্যাশিত। বললাম : দাও। মনে মনে ভাবলাম : দরখাস্ততেই এই! এখনও ইণ্টারভিউ, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, সবই তো বাকি আছে! তারপর বরখাস্তও আছে। অবশ্য সেকথা দরখাস্তের সময় না ভাবাই ভাল ও বাঞ্ছনীয়।

চাকরি পেলাম—ব্যাঙ্কে—বংশগত চাকরি কেরানীগিরি। দেখতে দেখতে দাম চড়তে লাগল আমার, ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ফাটকা-বাজারের শেয়ার কোথায় লাগে। দরখাস্ত লেখা দেখেই পিসিমা চা-খাবার দিয়েছিলেন। জীবিকাহীন জীবনে খাদ্যশেষের যে দইটুকু ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল, ইণ্টারভিউয়ের দিন তার পুনর্বহাল হল। প্রথম যেদিন চাকরি করতে যাব সেদিন ঠিক অভিষেকের মতন আয়োজন হল বাড়িতে। বাবার পাশে খেতে বসলাম, অস্তগামী কেরানীর পাশে উদীয়মান কেরানী। মাছের মুড়োটা নিজের বাটি থেকে বাবা আমাকে তুলে দিলেন। মা'কে বললেন ঃ "যাবার সময় টিফিনের কৌটোটা ওকে মনে করে দিয়ে দিও।" পিসিমা পাশে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। আপিস যাবার সময় মনে হল, সকলে যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে, রাস্তার লোক, ট্রামের লোক। সকলের মধ্যে আমি একজন, আমার মূল্য আছে আজ। মনে হল, আমার মাইনেটা দিয়ে সকলে যেন আমার মূল্য যাচাই করছে।

একে-একে আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে ছিলেন, সকলেই আত্মীয়তা জানাতে এলেন। "চিনতে পারছ বাবা, আমি তোমার পিসেমশাই!" চিনি না, শুনিওনি কখনও। কেউ বললেন ঃ "আমি তোমার কাকা হই—তোমার ঠাকুরদাদা আর আমার বাবা মামাতো-পিসতুতো ভাই"। সবই বুঝলাম, কিন্তু বুঝে করব কি? ভিক্ষার ঝুলি আর টাকার থলের কথা মনে আছে?

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটুম্ব দোহে ভুলে গেলি কি রে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

কাকা-জ্যাঠা, মেসো-পিসে, যাঁরা এলেন তাঁদের এই কথাই বললাম। কোন এক ইংরেজ কবির চমৎকার কয়েকটি কথা মনে হল—

Man should not earn his living
If he earns his life, he will be lovely.

ভাবলাম, কি মূল্য আছে একথার? জীবনই সুন্দর, জীবিকা নয়। এই ডারুইনিয়ান জীবজগতে একথার কোন মূল্য নেই। এখানে আমরা জীবিকা অর্জন করি, জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই আমার প্রথম জীবিকার অভিজ্ঞতা।

১৬

এক ছিলিম তামাক

Staal, one of the ablest historians of tobacco, is correct in his statemement that "no other plant has infiuenced as extensively as the tobacco the economic and cultural life of all humanity." —Julius E. Lips

তামাক ও ধূমপানের কাহিনী বলছি। কাহিনীটি পড়বার আগে মনে রাখবেন—it is not a tale told by an idiot, full of sound and fury। তুজন বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী স্টাল ও লিপ্‌সের মতে—'it signifies something'

বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতীর্থ ত্রিবেণী পরিদর্শন করতে গিয়ে সেদিন নানারকমের মাটির পাত্র দেখলাম। মাটির কলসী হাঁড়ি-মালসা, গামলা, পুতুল ইত্যাদি। যত্রতত্র এসব জিনিস প্রচুর দেখা যায়, মাটির পাত্রের ছড়াছড়ি বাংলাদেশে। তবু ত্রিবেণীর কয়েকটি হাঁড়ি-কলসীর বিচিত্র গড়ন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে যায়। মাটির হাঁড়ি-কলসীর আবার দেখবার কি আছে? মাটির পাত্রের অনেকটা অংশ যে এখনও কুম্ভকাররা হাতে পিটে তৈরি করে, একথা আগে অনুমানে জানা থাকলেও সঠিক জানতাম না। হাঁড়ি-কলসীর সমস্ত তলার অংশটাই হাতে পিটে তৈরি, এবং হাতে তৈরি অংশটুকু সবটাই মেয়েদের তৈরি। একথাও সম্পূর্ণ জানা ছিল না। কুম্ভকারের মুখে সব সবিস্তারে শুনলাম। কথাবার্তার সময়টুকুর মধ্যে কৌতূহলী লোকের বেশ ভিড় জমে গেছে দেখলাম। কৌতূহল ও ভিড় উভয়েরই একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেটা তখন খেয়াল হয়নি। পরে যখন খেয়াল হল তখন আর পশ্চাদপসরণের সময় নেই। গম্ভীরভাবে সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে আমাদের সাধু উদ্দেশ্য সহজ কথায় ব্যাখ্যা করে আমরা প্রস্থান করলাম।

মাটির হাঁড়ি-কলসীর সঙ্গে ছোটবড় নানারকমের গড়নের মাটির কল্কে ছিল। তার মধ্যে এমন কতকগুলি অদ্ভুত গড়নের কল্কে ছিল যা আগে কোনদিন মনোযোগ দিয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সেই সব হরেকরকমের কল্কে নেড়েচেড়ে দেখছিলাম বলে ত্রিবেণীর ঘাটে আমাদের ঘিরে ভিড় জমেছিল। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। পরে কল্কে সম্বন্ধে কন্‌সাস হয়ে ব্যাপারটা কনট্রোল করে ফেললাম। যাই হোক, হাতেগড়া মাটির কল্কে যা আজীবন দেখছি তা হল হুঁকোকল্কের কল্কে, অর্থাৎ তামাক খাওয়ার কল্কে। অনেক রকমের গড়ন দেখেছি তার। সবই হাতে তৈরি। কিন্তু গাঁজার কল্কের যে এতরকমের গড়ন হয়, কোনদিন ভাল করে দেখিনি। তামাকও গাছের পাতা, গাঁজাও তাই। আরও নানারকমের গাছের পাতা আছে, শুকনো অবস্থায় যার ধূমপান করলে নেশা হয়। কল্কে দেখলে মনে হয়, গাঁজার কল্কে একেবারে আদি অকৃত্রিম কল্কে। কিন্তু প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। ধূমপানযোগ্য বন্য-গাছের পাতা, তৃণ-গুল্মলতার মধ্যে কোন্‌টি কবে মানুষ আবিষ্কার করেছে মৌতাতের জন্য,

তা জোর করে বলা যায় না। কারণ তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কোন সম্রাট তার কোন প্রমাণ রেখে যাননি। তামাক আগে, না গাঁজা আগে, না ভাং বা আফিম আগে তাও বলবার কোন উপায় নেই। যব, গম, ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্য নিয়ে যেমন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন এবং মোটামুটিভাবে তার প্রাথমিক চাষ-আবাদের ভৌগোলিক অঞ্চলও নির্দেশ করেছেন, নেশার বন্য-গাছপালার উৎপত্তি বা আবাদ সম্বন্ধে তেমনভাবে কেউ কোন গবেষণা করেননি। খাদ্য-শস্যের চাষ-আবাদের আগেই এই সব বন্য গাছপালার সন্ধান মানুষ পেয়েছিল কিনা এবং তার নির্যাস ও ধোঁয়ার মাদকতার কথা জানতে পেরেছিল কিনা, তাও বলা যায় না। পাওয়া খুবই সম্ভব। যাযাবর অবস্থায় মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তখন তার প্রধান কাজ ছিল দুটি। বন্যজন্তু শিকার করা এবং বনের ফলমূল সংগ্রহ করা। বনের ফলমূল সংগ্রহ করতে করতে তাদের মধ্যে কেউ বুনো তামাক ভাং ইত্যাদির পাতা ও বীজ যে কোনদিন খেয়ে দেখেনি তা নয়। খেয়ে নেশায় ঢুলে পড়েছে এবং তার অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গীদের কাছে বলেছে। তারপর তামাক, গাঁজা, ভাং ইত্যাদির গুণাগুণ বুঝতে ও প্রচার করতে তাদের দেরি হয়নি।

আদিম যাযাবর বর্বর জীবনে তামাক, ভাং-এর প্রয়োজন বেশী ছিল, না সভ্য জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, একথাও দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। স্টাল ও জুলিয়াস লিপ্‌স, যাঁদের কথা গোড়াতে এক সঙ্গে উদ্ধৃত করেছি, দুজনেই বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী। তাঁরা বলেছেন যে, সারা পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তামাক যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছে, এমন আর অন্য কোন উদ্ভিদ্ করেনি। তামাক-প্রসঙ্গে বলে কথাটা হয়ত হাল্‌কা মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিই। বাংলা-

দেশের সাধারণ দরিদ্র চাষীরা অনেকেই তুবেলা অন্নভক্ষণের বিলাসিতা কি তা জানে না। কিন্তু শহুরে যে কোন চেইন-স্মোকারের ধূমপানের বিলাসিতা গ্রামের যে কোন অর্ধভুক্ত দরিদ্র চাষীর তামাক সেবনের বিলাসিতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। 'এক-ছিলিম তামাক' আর এক মুঠো ভাত—এই তুয়ের মধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোন্‌টির প্রাধান্য বেশী, তা বলা মুশ্‌কিল। ভাতের চেয়ে তামাকের গুরুত্ব বেশী, একথা উচ্চারণ করাও অন্যায়। মহাপাতকরাও এমন কথা বলবেন না, এবং আজকের দিনে আকাটা অধ্যাত্মবাদীরাও বলতে দ্বিধাবোধ করেন। তবু সাধারণ বাঙালীর জীবনে এক-ছিলিম তামাকের গুরুত্ব যে কত বেশী তা অসাধারণরা সহজে বুঝতে পারবেন না। বাঙালী নয় শুধু, বাঙালী, বিহারী ওড়িয়া, তামিল থেকে চীনা, নিগ্রো, ইয়োরোপীয় জনসাধারণের জীবনে একছিলিম তামাকের প্রভাব যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট গল্প মনে পড়ছে। মালদহ জেলার রাম-চন্দ্রপুর গ্রামে আমার মামার বাড়ি। ছেলেবেলায় প্রায় মামাবাড়ী যেতাম বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম খেতে। একদিন দেখি এক বৃদ্ধ চাষী তার আট-নয় বছরের একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছে, রাখালের কাজে বহাল করার জন্য। দিদিমার জিম্মায় ছেলেটিকে দিয়ে সে খুবই নিশ্চিন্ত, বারবার সেই কথা দিদিমাকে বলে সে বুঝিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু তবু ছেলেটিকে রেখে সে চলে যেতে পারছে না। বাইরের দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে আর আসছে এবং দিদিমার সামনে এসে কি যেন বলবে বলবে করছে। ভাবগতিক দেখে দিদিমা নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন: "কিছু বল্‌বি রে?" সে বলল: "বুল্‌তে লাজ লাগছে দিদি! বুল্‌ছি কি ব্যাটাকে হামার একটু তামুক খেতে দিও। ভাত না খেলেও ব্যাটার কিছু হবে না, কিন্তু তামুক না খেলে প্যাট ফুলবে।" কথাটা আমার আজও মনে আছে। বৃদ্ধ পিতার আবেদন শুনে বালক পুত্র মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে দেখলাম। দিদিমা

যখন তামাকের সুব্যবস্থার গ্যারান্টি দিলেন, তখন একগাল হেসে সে চলে গেল। এর মধ্যে দেখি সেই বাচ্চা ছেলেটি একদৌড়ে বাড়ির দফাদারের কাছে গিয়ে, তার হাত থেকে ধূমায়মান কল্কেটি কেড়ে নিয়ে দুই হাত মুঠো করে ধরে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিরিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেলাম। কি চমৎকার এফিসিয়েন্সি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত কল্কে টানার ট্রেনিং না পেলে এরকম এক্সপার্ট হওয়া সাত-আট বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। তামাক না খেলে ঐ ছেলের যে সত্যিই পেট ফুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কল্কেতে ধূমপানের পদ্ধতিটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম।

তখন তামাকের মর্যাদা বুঝতাম না, সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বুঝবার মতন বয়সও হয়নি। এখনও সেই ছেলেটির কল্কের টানের কথা মনে পড়ে। দুই হাতের মধ্যে কল্কেটি ধরবার ভঙ্গি এবং হাতের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া টেনে বার করার কৌশলের কথা ভাবলে মনে হয়, এই হল ধূমপানের সবচেয়ে প্রিমিটিভ পদ্ধতি। মাটি দিয়ে হাতে কল্কে গড়া যায়। কল্কে গড়নের বৈজ্ঞানিক সূত্রটিও খুব সহজ সরল। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ডায়েমিটার ক্রমে ছোট করে গড়লেই তামাকের ধোঁয়া প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। হাতে পিটে মাটির পাত্র গড়ে, আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহারযোগ্য করে নেবার সময় মানুষের যে কল্কে গড়বার মতন বুদ্ধি হয়েছিল, তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। কাঁচা বা শুকনো তামাকপাতা, ভাং, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি না চিবিয়ে খেয়ে, এইভাবে কল্কের উপর পুড়িয়ে যদি তার ধোঁয়া সেবন করা যায়, তাহলে নেশাও হয়, আরামও লাগে এবং অবসর বিনোদনেরও সুবিধা হয়। এ সত্যও আবিষ্কার করতে আদিম মানুষের যে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তা মনে হয় না। হুঁকোর জলে ধোঁয়াটাকে ধুয়ে নেওয়ার চিন্তাটা অনেক পরের। হুঁকো উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতীক। কিন্তু দুই-হাতের

মুঠোয় কল্কে বাগিয়ে ধরার পদ্ধতিটি রীতিমত প্রিমিটিভ। কল্কের বয়সও স্থূল হাতে-গড়া মাটির পাত্রের বয়সের সমান। অর্থাৎ কল্কে আগে, হুঁকো পরে। কল্কে না থাকলে হুঁকোর বিচিত্র বিকাশ হত না। ধূমপানের বিলাসিতার দিকটা, অবসর-বিনোদনের দিকটা যত বেড়েছে, তত কল্কের সাঙ্গপাঙ্গ হুঁকো গড়গড়া আলবোলা ইত্যাদির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। কর্মজীবনের প্রেরণা থেকে ধূমপান ক্রমেই অকর্মণ্যতার ইন্ধন হয়ে উঠেছে। কল্কে কর্মজীবনের প্রতীক, হুঁকো গড়গড়া আলবোলা ইত্যাদি আয়াস ও আলস্যের প্রতীক। এমন কি কল্কের প্রত্যক্ষ বংশধর পাইপও তাই। কল্কের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করব।

দেশ-বিদেশের মানুষের ধূমপানের পদ্ধতি দেখলেই বোঝা যায় যে, কল্কে বা কল্কে জাতীয় অন্য সব জিনিসই হল আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু কল্কের বা পাইপের কথা বলার আগে তামাক খাওয়ার কথা বলা দরকার। তামাক খাওয়ার প্রচলন হল কবে ও কোথায়? তামাক সম্বন্ধে সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল জানিয়ে নৃবিজ্ঞানী লিণ্ডব্লোম (Lindblom) ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে—Probably everyone is now agreed that tobacco reached America from the old world. একথা বলার উদ্দেশ্য হল বিশেষজ্ঞরা এতদিন মনে করতেন যে—Snuff, Cigarettes, Cigars, Pronged Cigar-holders and tobacco pipes are Indian inventions. এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা এখনও হয়নি। বিড়ি-সিগারেট, চুরুট যাঁরা খান তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না যে পণ্ডিতমহলে তাই নিয়ে কিরকম গবেষণা হয়। সাধারণ গাঁয়ের লোক এক-ছিলিম তামাক খেয়ে দশ গ্যালন পেট্রলের সমান এনার্জি পান, তাতেই তাঁরা খুশি। ছাই হয়ে উড়ে যায় তামাক, তা নিয়ে গবেষণা করার কোন কারণ থাকে না।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা বিড়ি-সিগারেট খান একটু চাঙ্গা হবার জন্য। ধনিকরা ধূমপান করেন, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্য। কবি-শিল্পীরা হয়ত সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে নিজেদের কবিসত্তাকে বিলীন করে দেন। কিন্তু কেউ কোনদিন এক-ছিলিম তামাক খাওয়ার সময় তামাকের উৎপত্তি, প্রসার বা তামাক খাওয়ার প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে এক-মুহূর্ত চিন্তার অবকাশ পান না। এক-ছিলিম তামাক খাব, তা নিয়ে আবার অত গবেষণার দরকার কি? সেকথা ঠিক, কিন্তু তামাক নিয়ে গবেষণার কথাটাও মিথ্যা নয়। যাঁরা তামাক নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা তামাক খান কি না জানি না, তবে যাঁরা খান তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। যেমন তামাক, নস্য, সিগার-পাইপ ইত্যাদি সব আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের আবিষ্কার বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, তা নয়। আমেরিকার বাইরে থেকে তামাক খাওয়ার রীতি আমেরিকায় প্রচলিত হয়েছে। দুই দলের পণ্ডিতদের মধ্যে আজও কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি এবং তার জন্য তামাক খাওয়া আটকে নেই। একদল পণ্ডিত আছেন তাঁরা বলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে কলম্বাস ওয়েস্ট ইণ্ডীজের আদিম জাতির কাছ থেকে প্রথমে ধূমপানের সন্ধান পান। এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধূমপানের প্রথা প্রচলন করেন। মোগলযুগের শেষে পর্তুগীজরা নাকি ভারতবাসীদের ধূমপান করতে শেখায়, এবং তারপর ধূমপান সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কেউ বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা প্রথমে যখন আমেরিকান মহাদেশে যান, তখন সেখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে "habit of producing smoke from an herb held in mouth" দেখে চমৎকৃত হন এবং সেই অভ্যাসটি ইয়োরোপে বহন করে নিয়ে এসে বদভ্যাসে পরিণত করেন। জ্যাঁ নিকত (Jean Nicot) নামে পর্তুগীজ রাজসভার একজন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ধূমপানের অভ্যাস সেখানকার রাজকর্মচারী মহলে প্রথমে চালু করেন। এই ফরাসী রাষ্ট্রদূতই

নিকোটিনের আবিষ্কারক শোনা যায়। পণ্ডিতমহলে এক-ছিলিম তামাকের এরকম অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বেশ কড়া দু-চার ছিলিম তামাক না খেলে এরকম বিচিত্র গবেষণা করা সত্যিই যে সম্ভব নয়, একথা পণ্ডিতদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বলা যায়। পরের হাতে তামাক খেতে যেদিন থেকে পণ্ডিতেরা শিখেছেন তার অনেক আগে থেকে নিজের হাতে মানুষ তামাক খেয়ে আসছে।

প্রথমে আদিবাসীদের কথা বলব। আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় সকল শ্রেণীর আদিবাসীই তামাক খায়। কেবল তামাক খায় বললেই সব বলা হয় না। ধূমপানের এত রকমের সব যন্ত্র ও পাত্র তাদের আছে যা সাজিয়ে রাখলে যে কোন আধুনিক উঁচুদরের টোবাকোনিস্টের দোকানকেও টেক্কা দিতে পারে। আসামের নাগারা খুব তামাক খায়, আফিমও খায়। নিজেরাই তারা তামাক চাষ করে। অবশ্য সাধারণত নাগারা কল্কেতে তামাক খায় না, আধুনিক সভ্য মানুষের মতন পাইপে তামাক খায়। পাইপটা কিন্তু সভ্য পাইপ নয়, বর্বর পাইপ, নাগাদের নিজেদের তৈরি। পর্তুগীজ বা বৃটিশ কোন সাহেবের পাইপ দেখে তৈরি নয়। সেমা নাগাদের পাইপের নাম আখথু। দুরকমের পাইপ আছে, এক রকমের নাম তলুপ, আর এক রকমের নাম তস্থুনকুবা। তলুপের সঙ্গে যে কোন আধুনিক পাইপের তুলনা করা যায়। একটি বা দুটি খণ্ড বাঁশ দিয়ে তলুপ তৈরি। আর তস্থুনকুবা হল কতকটা আমাদের দেশী হুঁকোর মতন। তিনখণ্ড বাঁশ দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে একটি হল বাঁশের চোঙ বা খোল, যাতে জল থাকে, একটি নল লাগানো পাইপ, আর একটি উপরের তামাকপাত্র। দেশী বাঁশের তৈরি তামাক খাবার পাইপ ও হুঁকো যে কত সুন্দর হতে পারে তা সেমা নাগাদের তলুপ ও তস্থুনকুবা না দেখলে বোঝা যায় না। নাগাদের মতন

অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে ধূমপানের রীতিমত প্রচলন আছে। আদিবাসীদের মধ্যে যারা হিন্দুসমাজের তলায় এসে পড়ে রয়েছে তারা আজও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ধূমপান করে। হাড়ি ডোম চর্মকার, এদের কথা বলছি। সাধারণ চাষী ছেলের এক ছিলিম তামাক না হলে তৃপ্তি হয় না, কাজে প্রেরণা আসে না। এসব দেখলে মনে হয়, তামাক না খাওয়াটাই আশ্চর্য, খাওয়াটা নয়। আর তামাক খাওয়ার রীতিটা যে পর্তুগীজ সাহেবরা আসার অনেক আগে থেকেই এদেশে চালু ছিল, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। ওড়িয়াদের তামাক ও পানের চমৎকার থলিয়াটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে ওটা একটা সুদীর্ঘকালের জাতীয় অভ্যাসের শিল্পপ্রতীক। ধার-করা অভ্যাসের ফলে ওরকম সুন্দর থলে তৈরি হয় না। মেলানেসিয়া মাইক্রোনেসিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, সর্বত্রই পান খাওয়ার অভ্যাস প্রবল দেখা যায়। বিচক্ষণ নৃবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ওটা নাকি আমাদের ভারতীয় সদাগরদের দান। তাঁরাই এসব দেশের লোককে পান চিবুতে শিখিয়েছেন এবং পান-চিবনো এখন আফ্রিকা থেকে মেলানেসিয়া পর্যন্ত একটা সামাজিক শিষ্টাভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামাকের মতন পানও গাছের পাতা (অবশ্য ডালপালাযুক্ত গাছের নয়) এবং পানের সঙ্গে তামাকের সম্পর্কও কতকটা মামা-ভাগনের সম্পর্কের মতন বলে পানের কথা বলছি। তামাক না হলে পান খাবার কোন মানেই হয় না, এরকম কথা পানবিলাসীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়। যাই হোক, পান খাওয়ার অভ্যাসটা আমাদের দেশ থেকে সদাগররা যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন বাইরে, তাহলে সেটা তমলুক অথবা দক্ষিণ-ভারতের কোন বন্দর থেকে গেছে। ভাং-এর প্রচলন বাইরে কি রকম আছে জানি না, আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। সকলেই জানেন, আমাদের জাতীয় দেবতা শিব ভাং ও গাঁজার ভক্ত। ভাং ছাড়া শিব কিছুতেই খুশি হন না। সম্প্রতি তারকেশ্বরে গিয়ে শুনেছি, বিশেষ উৎসবপার্বণে তারকেশ্বরে যে পরিমাণ সিদ্ধি বিক্রী হয় তা

কল্পনাতীত। চৈত্রমাসের গাজনের সময় বোধ হয় কয়েক মণ ভাং ও গাঁজা শিবের ভক্তরা নিজেরা সেবন করেন এবং 'বাবাকে' নিবেদন করেন। শিবের সঙ্গে ভাং ও গাজার যেরকম নিবিড় ধর্মানুষ্ঠানিক সম্পর্ক দেখা যায়, তাতে মনে হয় শিবের উৎপত্তিস্থানের কাছাকাছি কোথাও এই দুই মহানেশার প্রচলন হয়েছিল। শিব হলেন কিরাত-দের দেবতা এবং কিরাতরা আদিম মঙ্গোলজাতি। হিমালয় হল শিবের বাসস্থান। হিমালয়ের গাছপালা সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা জানেন, সেখানে সিদ্ধি ও গাঁজা হয় কি না। হয় বলে মনে হয়। হিমালয় বা পার্বত্য অঞ্চলের বন্য উদ্ভিদ্ প্রথমে পার্বত্য জাতির লোকরাই হয়ত সেবন করতে আরম্ভ করে। নেশার জন্যই যে করে তা নয়। হয়ত প্রথমে বনৌষধির মতন ব্যবহার করে, তারপর তার মাদকতার আস্বাদ পেয়ে মাদকদ্রব্যে পরিণত করে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমে উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে ভাং ও গাঁজার প্রচলন হয়। এটা অনুমান হলেও বেশ যুক্তিযুক্ত অনুমান নয় কি? তামাক ভাং, গাঁজা, আফিম, চরস ইত্যাদি নেশার প্রসার সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা উচিত। অভ্যাস হিসেবে এগুলিও "cultural item" এবং এরও প্রসার হতে পারে নানাকেন্দ্র থেকে। সাধারণত অন্যান্য সাংস্কৃতিক আচার বা অভ্যাসের প্রসার হয় নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এক জায়গার আচার অন্য জায়গায় অনায়াসে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধূমপান বা নেশার মতন আচার অবাধগতিতে প্রসার-লাভ করে। তার কারণ এই ধরনের সাংস্কৃতিক আচার গ্রহণ করার ফলে কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের 'কালচার-প্যাটার্নের' কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এই সব আচার-অভ্যাস প্রথার কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক function বা কাজ নেই। বিজ্ঞানীরা এই জাতের আচারকে তাই "নিউট্রাল" বা নিরপেক্ষ আচার-অভ্যাস বলেন। নিরপেক্ষ আচারের প্রসারণ-গতি অবাধ ও দুর্নিবার। সব বাধা ঠেলে সে স্বচ্ছন্দে এই কারণে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের

কল্কে হুঁকো বা তামাক, কি পান যদি আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহলে তাতে নিগ্রোদের যে নিজস্ব কালচার-প্যাটার্ন বা সংস্কৃতি-ডৌল আছে, তার কোন মারাত্মক পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বাংলার খোল-করতাল যদি আফ্রিকায় একবার প্রবেশাধিকার পায়, তাহলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য নিগ্রোরা ভারতীয় তামাক বা হুঁকো-কল্কেকে যত সহজে আমল দেবে, তত সহজে খোল-করতালকে দেবে না। এটা সমস্ত নিউট্রাল আচারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। নিউট্রাল আচার বা অভ্যাস স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, সক্রিয় আচার পারে না। যত রকমের নিউট্রাল আচার বা অভ্যাস মানবসমাজে আছে, তার মধ্যে আদর্শ নিউট্রাল হল তামাক খাওয়ার অভ্যাস। সেইজন্য তামাক অবাধ-গতিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) তাই বলেছেন :

Tobacco, as a relatively harmless indulgence, habit-forming but not leading to incapacity, and reasonably economical at that, has had a rapid, world-wide diffusion. It is also essentially neutral toward the ideology or value pattern of most of the cultures it entered. (Anthropology)

এই কথা বলে ক্রোবার তামাকের বিশ্বভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ক্রোবারের বিবরণ সবিস্তারে এখানে উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর বিবরণ সঠিক বলে মনে হয় না। ক্রোবার বলেছেন, প্রধানত স্প্যানিয়ার্ডরা তামাকের প্রচলন করে ইয়োরোপে এবং স্পেনীয় tabaco কথা থেকে ইংরেজী tobacco কথা হয়েছে। একথা হয়ত ঠিক। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ ও আরবরা তামাক ও চুরুট খাওয়ার প্রথা আফ্রিকা ও এশিয়ায় প্রচলন করেছে, একথা ঠিক নয়। তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি এখানে।

আদিবাসীদের তামাক খাওয়ার অভ্যাস কতদিনের প্রাচীন, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন না করেও বলা যায় যে স্প্যানিয়ার্ড পর্তুগীজ বা আরবদের দেশবিদেশে যাত্রার অনেককাল আগে আমাদের দেশের চরক ও সুশ্রুত ধূমপানের কথা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে, আলোচনা করে গেছেন। চরক বলেছেন ঃ

স্নাত্বা ভুক্ত্বা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জন নিদ্রান্তে চাত্মবান ধূমপো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, হাঁচি হলে দাঁত ধুয়ে, নস্য দ্বারা শির বিরেচনান্তে, নিদ্রান্তে এবং অঞ্জনান্তে ধূমপান করবে। সুশ্রুত বলেছেন ঃ

নরো ধূমোপযোগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রু-সুগন্ধি বিশদাননঃ ॥

অর্থাৎ ধূমপানে মানুষের ইন্দ্রিয় বাক্য ও মন প্রসন্ন হয়, কেশ দাঁত শ্মশ্রু দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধি ও বিশদ হয়।

ধূমপানের প্রথা লোকসমাজে কতকাল ধরে প্রচলিত থাকলে চরক ও সুশ্রুতের মতন মনীষীদের পক্ষে এরকম বিধান আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ধূমপানের প্রথা চলে আসছে। স্প্যানিয়ার্ড ও পর্তুগীজদের জন্মের অনেক আগে থেকে। আমাদের ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে নয় শুধু, পৃথিবীর সমস্ত আদিমজাতির মধ্যেই ধূমপানের বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। বিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী জুলিয়াস লিপ্‌স বলেছেন ঃ

The smoking of hemp and opium was probably known to the prehistoric Lake-dwellers, as extant implements indicate…In the primitive world, however, the desire to let the mind sojourn in 'artificial

paradise' often had religious reasons. (The Origin of Things : P. 158).

আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেও ধূমপানের প্রথা জড়িত আছে দেখা যায়। তামাক ভাং গাঁজা বা আফিম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা বা বীজ খেয়ে মত্ত হয়ে তারা ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেয়। অস্ট্রে-লিয়ার আদিবাসীরা এক ছিলিম তামাক না খেলে, দেবতারা বা ভূতপ্রেতরা তাদের স্কন্ধে ভর করে না। মায়া পুরোহিতরা ধূমপানকে ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ বা আচরণ বলে মনে করেন। মধ্য ও উত্তর আমেরিকার অনেক আদিম জাতির মধ্যে ধূমপানের বিচিত্র অভ্যাস দেখা যায়। পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকাতেও এক ছিলিম তামাকের প্রভাব যথেষ্ট।

নৃতত্ত্বের কণ্টকাকীর্ণ তথ্যের ভিতর প্রবেশ করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, এক ছিলিম তামাকের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। তার উৎপত্তি ও প্রসার যেভাবেই হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কারণ যাঁরা ধূমপানের মাহাত্ম্য বাইরে প্রচার করেছেন বলে শোনা যায়, তাঁদের জন্মের অনেক আগে থেকেই মানুষ সর্বত্র খুশি মতন ধূমপান করেছে দেখা যায়। এক ছিলিম তামাক শুধু যে মানুষকে কাজের অফুরন্ত প্রেরণা দিয়েছে তা নয়, তার ধর্মানুষ্ঠানেরও অপরিহার্য উপকরণ হয়েছে। তবু তামাক অনেকটা নিউট্রাল আচার বলে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। এত স্বাধীনভাবে যে আচার সর্বত্র বিচরণ করেছে তার উৎসকেন্দ্র কোথায় তা আজ আর ঠিক করা সম্ভব নয়। করার দরকারও নেই। শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই হল যে এক ছিলিম তামাকের একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। তা যদি না থাকত তাহলে তার অভাবে সেই রাখাল বালকটির পেট ফুলে উঠত না।

তামাক যখন মানুষ খেতে শিখল তখন তার মাদকতায় বিভোর হয়ে থাকা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি হত তাহলে তামাক

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

খেয়েই অনেককাল আগে মানুষ উচ্ছন্নে যেত, এতদূর এগুতে পারত না। আদিম শিকারী বা চাষীরা তামাক খেয়ে, ভাং বা আফিং খেয়ে যদি মাঠেঘাটে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাক্‌ত, তাহলে আজ তামাকের ইতিহাস লিখত কে? তামাক যাঁরা খান এবং যাঁরা খান না, তাঁরা সকলেই এই কথাটা ভেবে দেখবেন। তামাক কি সত্যিই 'নিউট্রাল' ছিল? এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয়, কোনকালেই ছিল না। তামাক চিরকালই অ্যাক্‌টিভ বা সক্রিয়। মাঠে হাল চষতে যাবার সময় এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ হালচাষ সম্বন্ধে চৈতন্য বাড়বে বলে, অচৈতন্য হবার জন্য নয়। মাঠ থেকে ফিরে সবার আগে এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ দেহের ক্লান্তি দূর হবে তাতে। দাঁড় টানতে, বোঝা বইতে, মেহনৎ করতে, এক ছিলিম তামাক না হলে চলে না। কারণ তামাক বলসঞ্চার করে। ধর্মের অনুষ্ঠানে ওঝা বা পুরোহিতের যখন তামাকের প্রয়োজন হয়, তখনও তামাকের ভূমিকা সক্রিয়। ধর্ম হল সংঘবদ্ধ জীবনের অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ, তামাক তার প্রেরণা, তামাকের ধোঁয়া তার বাষ্পীয় শক্তি। তাই আদিম ও অসভ্য লোকসমাজে ধূমপানের এত বিচিত্র আয়োজন ও সরঞ্জাম। সভ্য মানুষ তামাকের সক্রিয় ভূমিকাকে নিউট্রাল করেছে। তামাক হয়েছে নিছক মাদকতা নেশা ও বিলাসিতার উপকরণ। কল্কের সঙ্গে যত সব লম্বাচওড়া আনুষঙ্গিক যোগ করা হয়েছে তামাককে একেবারে নিষ্ক্রিয় করার জন্য। এক ছিলিম তামাক যখন শুধু কল্কেতে ধূমায়িত হত তখন সেই ধোঁয়া জীবন-ইঞ্জিনের বাষ্পের কাজ করত। কিন্তু কল্কে যখন ক্রমে খেলো হুঁকো থেকে বিশাল গড়গড়া বা আলবোলার মাথায় বসল এবং তার লম্বাচওড়া নল কয়েক গজ দূরে গিয়ে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে আরম্ভ করল, তখন বোঝা গেল মধ্যযুগের আলস্য, অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার প্রতীক হয়েছে তামাক। জীবনের সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ কল্কের যে-রকম ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, লম্বা নলওয়ালা গড়গড়ার তা নেই। কল্কের যুগে হাতের জোর ছিল বোঝা যায়, ফুস্‌ফুস্‌ও

সজীব ছিল। গড়গড়ার নলের যুগে হাতের জোর গেল কমে, তাকিয়া ঠেস দেবার প্রয়োজন হল। তারপর এল বিড়ি-সিগারেটের আধুনিক যুগ। একটার পর একটা ফুঁকে যাচ্ছি, কেন ফুঁকছি বলতে পারি না। অত্যন্ত তরলচরিত্র ইণ্ডিভিডুয়ালদের যুগ। বিড়ি-সিগারেট এই নব্যযুগের 'ইণ্ডিভিডুয়ালের' প্রতীক। মেহনতী মানুষের মেরু-দণ্ডহীন বংশধরের লিক্‌লিকে আঙুলের ডগায় শোভা পায় সিগারেট। এমন কি সিগার বা চুরুটও যে ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার কারণ আমাদের পৌরুষ ও জীবনশক্তি কমে যাচ্ছে। যাঁদের কমেনি, যাঁরা এখনও বীরের মতন কাজ করতে পারেন, তাঁরা চুরুট বা পাইপ খান। চার্চিল ও স্টালিন তার প্রমাণ। চুরুটপন্থী চার্চিল এখনও একা ইংলণ্ডের হাল ধরে রেখেছেন, সিগারেটপন্থী হলে পারতেন কি না সন্দেহ। আর স্টালিন যদি সবচেয়ে প্রিমিটিভ পাইপপন্থী না হতেন, তাহলে তাঁর সমাজতন্ত্রের তরী অনেককাল আগেই ভরাডুবি হত।

এক ছিলিম তামাক পোড়া মাটির কল্কেতে বা বাঁশের কিংবা কাঠের পাইপে সেজে খাবার যুগ ক্রমেই যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। হুঁকো বা গড়গড়ার যুগ আর ফিরে আসবে না কোনদিন, না এলেও দুঃখ নেই। কারণ ফরাস ও তাকিয়ার হারানো জীবন ফিরে না আসাই মঙ্গল। কিন্তু কল্কে বা দেশী পাইপের যদি পুনর্জীবন হয়, তাহলে হয়ত আমরাও আবার নতুন জীবন পেতে পারি। কিন্তু যতদিন অভাব-অভিযোগ থাকবে, জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানি থাকবে, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে, বেকার জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, ততদিন বিড়ি-সিগারেটের স্বর্ণযুগ চলবে। ততদিন কেবল ফুঁকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কেবল ফোঁকার পালা যতদিন না শেষ হবে, ততদিন কল্কের ও পাইপের যুগ আসবে না। ফোঁকার বদলে টানার যুগ আসবে তখন। একটার পর একটা সিগারেট ফোঁকার ফক্কাবাজির যুগ নয়, এক ছিলিম তামাক টানার বলিষ্ঠ সক্রিয় যুগ।

১৭

বাজার-ভাও ও বহুবিবাহ

১৯৫১ সালের আগস্ট মাস। কলকাতা শহরের কোন হোটেলে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ চলছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশ। বন্ধুটি এক বনেদী বংশের কুলীন ব্রাহ্মণ-নন্দন। বয়স চল্লিশাভিমুখী, দুচারটে চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু বন্ধু তখনও অবিবাহিত "কুমার", ছদ্মবেশী কুমার নন, বিশুদ্ধ ভেজালশূন্য "কুমার"। বিয়ে করবার ষোল আনা ইচ্ছা আছে, অথচ বিয়েটা যেমন করেই হোক, শেষ পর্যন্ত আর ঘটে ওঠেনি। আলাপটা তাই নিয়েই হচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার দিনে জন্মগ্রহণ করেও তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার আগে পর্যন্ত কোন রকমেই বিয়ে করা সম্ভব হল না কেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিচ্ছিলেন বন্ধু। কৈফিয়তের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, আজ-কালকার সেই একঘেয়ে কৈফিয়ৎ—আর্থিক অনিশ্চয়তা। কিন্তু "একঘেয়ে" হলেও এ যে কত বড় বৈপ্লবিক সত্য তা বোধহয় একমাত্র "বর্ণাশ্রমধর্মীরা" ছাড়া আর সকলেই উপলব্ধি করবেন। "বর্ণাশ্রমধর্মীরা ছাড়া" এই জন্য বললাম যে, তাঁরা অর্থনৈতিক শক্তিকে "সত্য" বলে মনে করেন না, তার সক্রিয়তাতেও তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা মনে করেন "মনুসংহিতাই"

চরম সত্য, শাস্ত্রীয় বাক্য অকাট্য, অর্থনীতি তার কাছে ফুৎকারে উড়ে যায়। তাঁরা মনে করেন মানুষের সমাজ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের সমাজ, কতকটা হিমালয়ের মতন অচল অটল। হিমালয়েরও একটা ভাঙাগড়ার ইতিহাস আছে, অটল হিমালয়ও মধ্যে মধ্যে টলে ওঠে, ভূকম্পন হয়, কিন্তু "ভারতীয়" সমাজ তার চেয়েও অটল অচল অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে "বর্ণাশ্রমধর্ম" এবং তারই ঔরসজাত কুলাঙ্গার "কৌলীন্যপ্রথা" নূতন যুগের অর্থনৈতিক শক্তির চাপে ভেঙে যাচ্ছে এবং না ভেঙে গেলে সমাজের প্রসার ও প্রগতি কোনটাই সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলেতী ভাবোন্মাদ বামুণ্ডুলে জোর-জবরদস্তি করে মনু-যাজ্ঞবল্কের স্তম্ভগুলো সমাজের বুক থেকে উপড়ে ফেলছে এবং তারই ফলে সমাজের মধ্যে অনাচারের বন্যাস্রোত বইছে। কিন্তু যদি কোন বর্ণাশ্রমধর্মী আমার এ "অবিবাহিত" বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করেন (এবং এই রকম আরও হাজার হাজার কুমার কুলীনপুত্র ও লক্ষ লক্ষ বেশি-বয়সে-বিবাহিতদের সঙ্গে) তাহলে বুঝতে পারবেন "কে" বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙছে, "কেন" কৌলীন্যপ্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং কেন মনু বা বল্লালসেন চিরন্তন সত্য নয়। দশরথের সাড়ে তিনশ' পত্নী থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্র কেন এক ভার্যানুরক্ত হলেন তা গবেষণা করে জানা সম্ভব নয়। মনে হয় ওটা স্রেফ শ্রীরামচন্দ্রের খেয়াল-খুশি ছাড়া আর কিছু নয়। তখন গাওয়া ঘি বা পাটনাই চালের বাজারদর কত ছিল তাও মহর্ষি বাল্মীকি কোথাও লিখে যাননি। তবে সংসারত্যাগী মুনিঋষিদের আশ্রমে পর্যন্ত আতিথ্যের বহর দেখলেই আন্দাজ করা যায়, কি আরামে রামচন্দ্রেরা ও মুনি-ঋষিরা তখন ছিলেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁর আশ্রমে ভরত-সেনাদের আপ্যায়ন করছেন এই বলে ঃ

সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সং চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছসি॥

সুরাপায়িগণ, সুরা পান কর, বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা যত খুশি খাও। আশ্রমেই যখন এই, তখন রাজবাড়িতে কি হত তা কল্পনা করাই ভাল। বাল্মীকির যুগের ভরদ্বাজ মুনি এযুগের ভাইস্‌রয় বা প্রেসিডেণ্টের "পার্টি" দেওয়াকেও হার মানিয়েছেন। এত ভোগের যুগে যিনি রাজপুত্র:ছিলেন, যাঁর পিতার ৩৫০ পত্নী ছিল, তিনি কেন একটি মাত্র স্ত্রীতেই খুশি রইলেন, তা বলা মুশ্‌কিল। এক বিবাহ তখন যে সমাজের আদর্শ ছিল তাও নয়, কারণ পিতার ৩৫০ আর পুত্রের ১, অর্থাৎ ৩৫০ : ১ এই 'হারে' সামাজিক আদর্শের বৈপ্লবিক লম্ফন সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং ওটা হয় শ্রীরামচন্দ্রের 'খুশি', না হয় বাল্মীকির 'খেয়াল'। আমার বন্ধু রামচন্দ্র (দশরথ পুত্র নন, দামোদর পুত্র) খুশি মতন "একটি" বিয়েও করতে পারেননি। রামচন্দ্রের পিতা দামোদরবাবুর অবশ্য ৩৫০ নয়, মাত্র ৪ জন স্ত্রী ছিল। সুতরাং রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী বলা যেতে পারে, বন্ধু রামচন্দ্রের বিবাহের কোন অধিকারই নেই। সহজ অঙ্ক কষলে দেখা যায় :

রাজা দশরথ : ৩৫০ স্ত্রী
পুত্র শ্রীরামচন্দ্র : ১ স্ত্রী
দামোদরবাবু : ৪ স্ত্রী
পুত্র রামচন্দ্র : ৪।৩৫০ = ২।১৭৫ স্ত্রী

সুতরাং বন্ধু রামচন্দ্রের "কুমার" থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ কোন নারীর ১৭৫ অংশের দুই অংশকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা যদি রামায়ণের যুগের দিক থেকে না বিচার করে, বন্ধুর নিজের পারিবারিক ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, তাঁর অন্তত দুটি স্ত্রী থাকা উচিত, অথচ একটিও নেই। আগেই বলেছি, বন্ধুটি বনেদী কুলীন ব্রাহ্মণবংশের সন্তান। পারিবারিক ইতিহাস যা তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই জানাচ্ছি।

ছয় পুরুষ পর্যন্ত "ডেটা" সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সাতপুরুষ নয়। তাই এখানে table-বদ্ধ করছি স্থান সংক্ষেপের জন্য ঃ

(ঠা = ঠাকুরদাদা, বা = বাবা)

আনুমানিক কাল		বংশানুক্রম		ভাষানুক্রম
১৮০০ খৃঃ	ঃ	ঠা + ঠা + বা	ঃ	৬৪
১৮৫০ খৃঃ	ঃ	ঠা + ঠা	ঃ	৩২
১৮৭৫ খৃঃ	ঃ	ঠা + বা	ঃ	১৬
১৯০০ খৃঃ	ঃ	ঠা	ঃ	৮
১৯২৫ খৃঃ	ঃ	বা	ঃ	৪
১৯৫০-৫১ খৃঃ	ঃ	রামচন্দ্র	ঃ	২ (??)

[কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ঃ ১৯০০-২৫ সালের মধ্যে রামচন্দ্রের পিতা দামোদরবাবু ৪টি বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহ করেন ১৯১৩ সালে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান হলেন রামচন্দ্র—জন্ম ১৯১৪ সাল। এইভাবে পূর্বপুরুষদের বিবাহেরও হিসাব করা উচিত।]

অতএব, রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী না হলেও, পারিবারিক আদর্শ অনুসারে 'কুমার' রামচন্দ্রের বিবাহের অধিকার আছে। তার উপর তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান যখন তখন তো আছেই। রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী তিনি বিবাহ করতে পারেন ২/১৭৫ ভগ্নাংশ নারীকে, আর পারিবারিক আদর্শ অনুসারে ২ জনকে (পুরুষানুক্রমিক ভার্যা হ্রাসের ধারা ৫০% বা ½)। এই ধারাতে রামচন্দ্রের 'কুমার' থাকার কোন কারণ নেই, রামচন্দ্রের পুত্রেরও একজন স্ত্রী পাপ্য, রামচন্দ্রের নাতি অবশ্য "ব্যাচিলার" থাকতে বাধ্য। কিন্তু সে কথা থাক। এখন দেখা যাক এত বড় বনেদী কুলীন ব্রাহ্মণবংশের একমাত্র 'বংশধরের' আজ এই শোচনীয় কৌমার্য-জীবনে দণ্ডিত হবার কারণ কি? স্বভাবতই অনেকে বলেন যে, "কৌলীন্যপ্রথা" উঠে গেছে, এখন আর সেযুগ নেই, সুতরাং আর্থিক সঙ্কটের জন্য এরকম পারিবারিক ও

ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় হতে বাধ্য। কিন্তু "কৌলীন্যপ্রথা" উঠে গেছে বললেই "বর্ণাশ্রমীরা" মানতে রাজি হবেন না। সুতরাং "কৌলীন্যপ্রথা" কেন ও কি অবস্থায় গজিয়ে উঠেছিল, কি সামাজিক রূপ ধারণ করেছিল, তার ফলাফলই বা কি হয়েছিল, সে সব কথা কিছুটা জানা দরকার।

কৌলীন্যপ্রথার কথা ভাবলে একটা হাই তুলে বলতে ইচ্ছে করে, "আমি যদি জন্ম নিতেম কৌলীন্যের কালে।" কিন্তু জন্ম যখন নিইনি তখন হাই তুলে লাভ কি? এখানে ইতিহাসের গবেষণা করেও লাভ নেই, কারণ তা পড়বার মতন ধৈর্যও অনেকের নেই, জানি। তবু মনে হয় সেই যে ব্রাহ্মণ বা পরমপুরুষের শ্রীবদন, শ্রীবাহু, শ্রীজানু ও শ্রীচরণ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এত সব কাণ্ড ঘটল কি করে? অর্থাৎ ১৯০১ সালের মধ্যে ২৩৭৮টি "জাতি" গজিয়ে উঠলো কোথা থেকে? "মনুসংহিতায়" তার একটা নির্দেশ পাওয়া যায়। চারবর্ণের প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন সংকরবর্ণ ও শুদ্ধবর্ণের মিশ্রণে এইসব নানা জাতি-উপজাতির উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বিশাল একটা বাওলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ব্রিডিং ও ক্রস-ব্রিডিংয়ের ফলে এই ৩০০০ জাতের উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষে। ব্রিডিং থেকেই বিবাহের কথাটা এসে পড়ছে। বর্ণসম্মত বিবাহকে বলা হয় "অনুলোম" বিবাহ এবং বর্ণবিরুদ্ধ বিবাহকে "প্রতিলোম" বিবাহ। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর "ক্রসিং" তেমন আচার-বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু নিম্নবর্ণের পুরুষ আর উচ্চবর্ণের নারী মিলিত হলে একেবারে চরম অনাচার। সুতরাং চারবর্ণের মধ্যে এইভাবে পুরুষ-নারী ভেদে মিশ্রণের পার্মুটেশন্-কম্বিনেশন সহজ ব্যাপার নয়। যেমন

ক, খ, গ, ঘ, যদি চারবর্ণ হয়, তাহলে মিশ্রণ বা ক্রসিং এত রকমের হতে পারে—

ক—পুং × খ—স্ত্রী = চ
ক—স্ত্রী × খ—পুং = ছ
ক—পুং × গ—স্ত্রী = জ
ক—স্ত্রী × গ—পুং = ঝ
ক—পুং × ঘ—স্ত্রী = ঞ
ক—স্ত্রী × ঘ—পুং = ট
ইত্যাদি

এইভাবে খ, গ-এর মিশ্রণ হবে। তারপর যে সব সংকরবর্ণ হল, যেমন চ, ছ জ ঝ ইত্যাদি, তাদের উচ্চ-নীচ স্তরভেদে ও পুং-স্ত্রী ভেদে আবার ক্রসিং হবে। এই মাল্টিপ্লিকেশনের ফলেই নাকি এত জাত, এবং জাতের নামে এত বজ্জাতি।

এবারে কৌলীন্যপ্রথা সহজে বোধগম্য হবে। বর্ণভেদে বিবাহের বিধিনিষেধ একটা চিরকালই ছিল সমাজে, কিন্তু গুপ্তযুগ বা পালযুগ পর্যন্ত তার মধ্যেও 'উদারতা' বা 'সাবলীলতা' ছিল। ভিন্ন প্রদেশাগত সেন-বর্মণ রাজাদের আমল থেকেই "কৌলীন্যপ্রথার" প্রবর্তন হয় বাংলাদেশে। বাঙালী সমাজে কৌলীন্যপ্রথা-রূপ বিষ-বৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন অবাঙালী রাজারা এবং তার ফলেই বাঙালী সমাজ জাহান্নমের পথে দ্রুত নেমে গেছে। একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' ছাড়া আর সকলকে 'শূদ্র' বলে অভিহিত করা হল এবং শূদ্রের মধ্যে 'জল-আচরণীয়' ও 'জল-অনাচরণীয়' এই দুটো ভাগ করা হল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'ভাগ' আছে, তার মধ্যে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কথাই বলি। রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা 'কুলীন' ও 'শ্রোত্রিয়' দুই ভাগে বিভক্ত,

শ্রোত্রিয়রা আবার "সিদ্ধ, সাদ্ধ ও কাষ্ঠ" এই তিন উপশাখায় পল্লবিত। বিবাহের নিয়ম হল—

ক-পুং = সিদ্ধ স্ত্রী বা সাদ্ধ স্ত্রী বা কুলীন স্ত্রী
সিদ্ধ-পুং = সিদ্ধ স্ত্রী বা সাদ্ধ স্ত্রী
সাদ্ধ-পুং = সাদ্ধ স্ত্রী
কাষ্ঠ-পুং = কাষ্ঠ স্ত্রী
কাষ্ঠ-স্ত্রী = কাষ্ঠ-পুং
সাদ্ধ-স্ত্রী = সাদ্ধ-সিদ্ধ-কুলীন পুং
সিদ্ধ-স্ত্রী = সিদ্ধ-কুলীন পুং
কুলীন-স্ত্রী = কুলীন পুং

এরই নাম 'কৌলীন্যপ্রথা'। 'পুরুষ' যত উচ্চবর্ণের হবে, স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রও তত তার প্রসারিত হবে, কিন্তু 'নারী' যত উচ্চ-বর্ণের হবে স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রও তত তার সঙ্কুচিত হবে। কুলীন পুত্ররা একমাত্র কাষ্ঠকন্যা ছাড়া শ্রোত্রিয়শাখার অন্যান্য কন্যাদের বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু কুলীন কন্যাদের কুলীন পুত্র ছাড়া নান্য পন্থাঃ। ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি কৌলীন্যপ্রথার প্রসার কায়স্থ ও সদ্‌গোপদের মধ্যে পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু 'প্রাক্‌টিসের' দিক থেকে ব্রাহ্মণরাই 'পার্ফেকশনে' পৌঁছেছিলেন।

কৌলীন্যপ্রথার প্রত্যক্ষ ফলাফল কি হল সমাজে? কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুমারী কন্যার প্রাচুর্য স্বভাবতই দেখা দিল, কারণ যে-কোন পাত্রের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেওয়া চলবে না, একমাত্র কুলীনপাত্র ছাড়া। কুলীন পাত্ররা অবশ্য শ্রোত্রিয় কন্যাদেরও বিবাহ করতে পারেন। সুতরাং কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবিবাহিত পাত্রের চেয়ে পাত্রীর সংখ্যাই বেশী থাকা স্বাভাবিক। অথচ কুমারী কন্যাদের 'কুমারী' রাখা চিরকাল চলে না, বিবাহ তাদের দিতেই হয়।

অবিবাহিত পাত্রসংখ্যা কম বলে একই বিবাহিত পাত্রে একাধিক কন্যাদানের প্রশ্ন দেখা দেয়। সুতরাং একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পুত্রের শতাধিক স্ত্রী থাকতেও বাধা নেই। ৬০ জন কুলীন কন্যা আর ৪০ জন শ্রোত্রিয় কন্যা মিলিয়ে স্বচ্ছন্দেই যে-কোন কুলীন-নন্দনের ১০০ স্ত্রী থাকতে পারে। তারপর পালা করে তিনদিন অন্তর শ্বশুরবাড়ী গেলেই পরম নিশ্চিন্তে ও তোয়াজে জীবনের গোণা দিনগুলো কেটে যেতে পারে, এমন কি পুরোহিতগিরি বা গুরুগিরি করারও দরকার করে না।

কিন্তু বিয়ে তো হল, তারপর? ১০০ স্ত্রী যাঁর তাঁর মৃতদার হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ ১০০ স্ত্রী পট্ পট্ করে মরে যেতে পারে না। আর যদিও বা এমন কোন 'মড়কের' কল্পনা করা যায় যাতে যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্বশুরালয়ে ১০০ জনই মরে গেল, তাহলেও কুলীন-নন্দনের 'কৌলীন্য' বজায় থাকা পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্বাস থাকা পর্যন্ত 'স্ত্রীর' অভাব হবে না। গঙ্গার ঘাটে শেষ অবস্থায় 'গঙ্গাজলি' করা পর্যন্ত কুলীন-পুত্রের বিবাহ হতে পারে। সুতরাং কুলীন-পুত্র চির-বিবাহিত, কিন্তু কুলীন-কন্যা? কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা সধবা হয়েও প্রায়-বিধবা এবং চির-বিধবা। ১০০ জন স্ত্রীর জীবনের একমাত্র সম্বল 'একটি' কুলীন স্বামী। স্বামী তো পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে ঘুরছেন এবং তিনি সর্বদাই গতিশীল ও ভ্রাম্যমাণ। ভোজনও করছেন সর্বত্র। যে-কোন শ্বশুরালয়ে হয়ত ভোজনাধিক্যে তিনি দেহত্যাগ করতে পারেন। তখন বাকি ৯৯ জন স্ত্রী সেই শ্বশুরালয়ে জমায়েত হয়ে যদি ক্রোধের জ্বালায় সেই স্ত্রীর মাথার চুল পর্যন্ত সমস্ত উপড়ে ফেলে দেন তাহলেও তাদের 'সধবা' হবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এ শুধু একটা বিশেষ কারণে মৃত্যুর কথা বললাম। অনেক কারণে মৃত্যু হতে পারে। শ্বশুরবাড়ী যাবার পথের মধ্যেও তাঁর মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য নয়। যে কোন কারণেই হোক, মৃত্যু হলে আর রক্ষা নেই। 'এক' স্বামীর

মৃত্যুতে ১০০ স্ত্রী বিধবা। এরকম ১০টি স্বামীর মৃত্যুতে ১০ × ১০০ = ১০০০ স্ত্রী বিধবা অর্থাৎ কৌলীন্যপ্রথার ফল বিধবার প্রাচুর্য এবং তার ফল কি? তার ফল, সমাজের বুকে গোপন দুর্নীতি, কলঙ্ক ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত। 'মনুর' চেয়েও শক্তিশালী যে 'প্রকৃতি', এ সেই "প্রকৃতির প্রতিশোধ।"

এর আরও একটা ফল আছে। সংখ্যা হ্রাস হতে হতে ক্রমে কুলীনরা নির্বংশের পথে এগিয়ে গেছেন। অসংখ্য নারী বৈধব্যের ফলে বন্ধ্যা হয়ে থাকে এবং তার ফলে কুলীন সমাজের লোকসংখ্যা কমে, বংশ ক্রমে নির্বংশ হতে থাকে। হয়েছেও তাই। আজ লোক-গণনার ফলে যে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের সংখ্যা তথাকথিত নিম্নবর্ণের তুলনায় অনেক কম এবং ক্রমে কমছে, তার কারণ ঐ কৌলীন্যপ্রথা এবং বিধবা-প্রাচুর্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌলীন্যপ্রথা উচ্চবর্ণের আত্মহত্যার 'প্রথা' ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু শাস্ত্র বা সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে পরিষ্কার বলা যায় যে, 'বহুবিবাহের' সঙ্গে 'বাজার ভাও'-এর একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সেন-আমলে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের 'বাজার দর' কত ছিল ঠিক আমার জানা নেই, তবে চাল, ডাল, ঘি, তেল, মাছ, মাংসের দর যে এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা যদি না থাকত তাহলে কৌলীন্যপ্রথা-তথা-বহুবিবাহ কোন মতেই সম্ভব হত না। কেন হত না তাই বলছি। ১০০ স্ত্রী যাঁর, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত স্ত্রীকে স্বগৃহে প্রতিপালন করতে পারেন না। তা করতে হলে প্রথমে তাঁর বিশাল রাজপ্রাসাদের মতন অন্তত শতকামরাযুক্ত বাড়ি থাকা দরকার, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণদের অনেকেরই তা ছিল না। থাকলেও, ১০০ স্ত্রী পালন করা সহজ ব্যাপার

নয়। 'বাজার ভাও' কত কম থাকলে তা করা যেতে পারে? তা অবশ্য কেউ করতেন না। যদি ধরা যায় যে, ১০ জন করে স্ত্রী পালাক্রমে স্বগৃহে রেখে, বাকি ৯০ জনের গৃহে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, তাহলেও যোথ পরিবারে ১০ জন স্ত্রীর বোঝা কম নয় এবং তা বহন করা 'বাজার দর' কম না থাকলে সম্ভবও নয়। অন্যদিক থেকে বিচার করলেও একই প্রশ্ন ওঠে। কুলীন কন্যার বিবাহ হলেও পতিগৃহে যাত্রা তার ভাগ্যে ঘটত না, পিতার গৃহে পিতার অন্নই তাকে খেতে হত। মনে করুন, কোন কুলীন ব্রাহ্মণের ৫ কন্যা, প্রত্যেকেরই তিনি বিবাহ দিয়েছেন, কিন্তু 'সধবা' অবস্থাতেও 'কুমারীর' মতন তাদের পালন করতে হচ্ছে, এমন কি 'বিধবা' অবস্থাতেও করতে হবে। তা ছাড়া, সধবা অবস্থায় পাঁচ জামাইয়ের ঘুরে ফিরে পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে আসা, থাকা ও খাওয়ার সমস্যা আছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে একমাস জামাই-সেবার খরচ, প্লাস পাঁচ কন্যার সারাজীবনের ভরণপোষণের খরচ! সুতরাং "বাজার ভাও" কম না হলে কিছুতেই এইভাবে কন্যাদান করা সম্ভব হত না। এখনকার কোন গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ কি এই শর্তে কুলীন পাত্রকে কন্যাদান করতে রাজি আছেন? জানি না, যদি কেউ থাকেন, জানাবেন। আমার বন্ধু রামচন্দ্রের মতন অনেক কুলীনপাত্র আজও অবিবাহিত রয়েছেন, বিবাহের আর্থিক দায়িত্বটুকু না নিতে হলে তাঁরা বিয়ে করতে খুশি মনে রাজি আছেন। কিন্তু তবু কি কেউ কন্যাদান করবেন? দুএকজন অবস্থাপন্ন কুলীন শ্বশুর হয়ত ঘরজামাই রাখতে রাজি হবেন, কিন্তু অনেকেই রাজি হবেন না, ঐ বাজার ভাও-এর জন্য।

সেন-আমলের 'বাজার ভাও' জানা না থাকলেও, যখন পর্যন্ত এই কৌলীন্যপ্রথা-তথা-বহুবিবাহ পূর্ণোদ্যমে চালু ছিল, তখনকার বাজার ভাও কিছু কিছু জানা যায়। মাত্র ১০০-১২৫ বছর আগেকার কথা বলছি। ১৮৩৬ সালের ২৩শে এপ্রিল, ১২০ বছর আগে, "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় 'ইয়ং বেঙ্গলের' মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" থেকে

কুলীন-বিবাহের একটি তালিকা উদ্ধৃত করে ছাপা হয়েছিল। তালিকাটির একাংশ আমি উল্লেখ করছি ঃ

নাম	বিবাহ-সংখ্যা
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২
নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
খুদিরাম মুখোপাধ্যায়	৫৪
দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫২
কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭
শম্ভু চট্টোপাধ্যায়	৪০
রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩৭
কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০
নকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	১৫
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
রামকানাই চট্টোপাধ্যায়	১২
গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮

ইত্যাদি

"জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকার সামাজিক তথ্যানুসন্ধানকে আজকালকার "ডেটা"-বাগীশরা নিশ্চয়ই হিংসা করবেন। আজকাল তো এ সব কাজ করাই হয় না বললে হয়, বিশেষ করে প্রগতিশীল পত্রিকার তরফ থেকে, যা "জ্ঞানান্বেষণ" বা "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্রিকায় তখন করা হত। যাই হোক, ১৮৩৬ সালেও কুলীনদের বহুবিবাহের বহর এই পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ আমার অবিবাহিত বন্ধু রামচন্দ্রের ঠাকুরদার কালেও কৌলীন্যপ্রথার যথেষ্ট প্রতাপ ছিল সমাজে। এখন দেখা

যাক, 'বাজার ভাও' কি রকম ছিল। ১৮১৯ সালের ২০শে নভেম্বর "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় 'বাজার ভাও' সম্বন্ধে জানা যায় :

এই সপ্তাহের বাজার ভাও :

পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মণ।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মণ।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মণ।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মণ।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মণ।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মণ।

১৮২২ সালের ১২ই জানুয়ারি 'বাজার ভাও' হচ্ছে :

জিনিস	মণ	মূল্য
অড়হর ডালি	১	৩।০-৩৸০
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২৭৲-২৮৲
ভৈসা ঘৃত	১	২৫৲-২৬৲
মিছরী উত্তম	১	১৪।০-১৫৲

১৯৫১ সালের সঙ্গে বাজার ভাও-এর তুলনা করা যাক :

জিনিস (প্রতি মণ)	১৮১৯-২২	১৯৫১	বৃদ্ধির হার
চাল	১৸০	৪০৲—৬০	প্রায় ৩০।৪০ গুণ
অড়হর দাল	৩।০	৩০৲	প্রায় ১০ গুণ
গাওয়া ঘি	২৭৲	৪০০৲—৫০০৲	প্রায় ২০ গুণ
ভয়সা ঘি	২৫৲	৩০০৲—৩২০৲	প্রায় ১২ গুণ
মিছরী	১৫৲	১৬০৲	প্রায় ১০ গুণ

এখানে 'চাল' যদি প্রধান খাদ্য ধরা যায়, তাহলে চালের মূল্য বৃদ্ধিকেই আসল ধরতে হয়। চালের প্রাধান্য অনুপাতে গড়্‌পড়তা মূল্যবৃদ্ধি সব জিনিসের আমরা ২০ থেকে ২২ গুণ পর্যন্ত ধরতে পারি। এইবার বাজার দরের সঙ্গে বহুবিবাহের সম্পর্কটা পরিষ্কার হবে।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের যে তালিকাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে কুলীন ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা বিবাহ-সংখ্যা হল ৫৯৬ ÷ ১৬ = প্রায় ৩৭ জন। এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়, তা ছাড়া 'জ্ঞানান্বেষণের' তালিকাও সমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। সুতরাং যথেষ্ট বাদ-সাধ দিয়েও আমরা কুলীন ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা বিবাহ-সংখ্যা মোটামুটি ৩৭/২ = প্রায় ১৮ জন ধরতে পারি। তাতে ভুলচুকের সম্ভাবনা অনেক কমে আসবে। 'বাজার ভাও' ২০।২২ গুণ বৃদ্ধির হিসেবে এবং চালের গুরুত্ব সত্ত্বেও অনেক বাদসাধ দিয়ে করা হয়েছে। এইবার "বাজার ভাও" ও "বহুবিবাহের" সম্পর্ক বা "কো-রিলেশন" কি দেখা যাক :

(১৮১৯-২২ এর বাজার দর ১ ইউনিট ধরা হচ্ছে)

বাজার দর	বিবাহ
১ (১৮১৯—২২)	গড়ে ১৮ জন স্ত্রী
২০ (১৯৫১)	১৮/২০ = ৯/১০
= পুরো ১ জনও	অবিবাহিত নয়

সুতরাং আমার বন্ধু রামচন্দ্রের আর্থিক কারণে অবিবাহিত থাকার যুক্তি আদৌ যুক্তিহীন নয় এবং কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কেবল বাজার ভাও-এর জন্যই যে তিনি 'একটি' বিবাহও করতে পারেননি, তাও মিথ্যা নয়। বর্ণাশ্রমীরা মানুন, আর নাই মানুন, প্রধানত আর্থিক কারণেই যে আমাদের সমাজের কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল স্তম্ভগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে কোন ভুল নেই এবং যা ভাঙছে তা ভালর জন্যই ভাঙছে, বিশেষ করে 'বহু-বিবাহপ্রথা তো নিশ্চয়ই।

স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস একত্রে পাঞ্চ করে ককটেল করা হল বলে কেউ যেন মনে করবেন না যে, আমার

কোন সিরিয়াস বক্তব্য নেই। বক্তব্যটা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে। বক্তব্য এই ঃ

আমাদের সমাজে বৃত্তিভেদ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রাক্‌-বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। সেই বৃত্তিভেদ বর্ণভেদে রূপান্তরিত হয় বৈদিক আর্যদের যুগ থেকে। বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রথম যুগে সমাজের মধ্যে সচলতা যথেষ্ট ছিল, কারণ বর্ণভেদটা ছিল প্রধানত বৃত্তিগত, ধর্মগত নয়। হিন্দুযুগে ধর্মগত বর্ণভেদের উপর ঝোঁক পড়ে বেশি এবং ক্রমে ঝোঁকটা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে। তারই পরিণতি হল ব্রাহ্মণ-সর্বস্বতা, কৌলীন্যপ্রথা এবং কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের উন্মত্ত প্রসার। এটা হল মৌলিক বৃত্তিভেদ, বৃত্তিগত শ্রমভেদ ও বৃত্তিগত বর্ণভেদের চরম সামাজিক বিকৃতি ও অবনতি। আদর্শের এই বিকৃতি তখনই সম্ভবপর, যখন সমাজের মূল্যের অর্থনৈতিক শক্তি অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়, প্রাণহীন কঙ্কালের মতন সেটা অচল অনড় হয়ে পড়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝির আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে অর্থনৈতিক শক্তির মূলগত কোন পরিবর্তন হয়নি। একথাটা সামাজিক নীতি বা আদর্শের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আবহমান কালের সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা ও দুর্নীতি আমাদের সমাজে রীতিমত প্রচলিত ছিল। কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থনৈতিক শক্তির পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নীতি ও আদর্শেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। কৌলীন্যপ্রথা ভাঙতে থাকে, বহুবিবাহ দ্রুত কমে যায়, বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয়, সহমরণ-প্রথা উঠে যায়। আজকের দিনে অনেক গোঁড়া কুলীনও, মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও, বহুবিবাহের কথা কল্পনা করতে পারেন না। তার কারণ, মনুসংহিতার চেয়ে অর্থ-সংহিতা এযুগে অনেক বড় সত্য, না এড়িয়ে চলতে গেলে খানায় পড়ে অপমৃত্যু ঘটা ছাড়া উপায় নেই। অতএব 'বহুবিবাহ' করার যাঁদের ইচ্ছা আজও আছে তাঁরা সেটা চেপে যান এবং সেই অবদমিত ইচ্ছাকে

অনর্থক একটা প্রাচীন অচল নীতি সমর্থন করে প্রকাশ করবেন না। অবশ্য 'বর্ণাশ্রমধর্মীরা' যে বহুবিবাহের এই অবদমিত গোপন ইচ্ছাকেই বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁদের মধ্যে একটা চরিত্রগত দুর্নীতি-প্রবণতা আছে, এমন কথা আমি বলছি না। আমি মনোবিজ্ঞানী নই। তবে যাঁরা মনোবিজ্ঞানী তাঁরা হয়ত এমন কথা বললেও বলতে পারেন। আমি বলছি, যা মৃত তাকে ফুঁ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা বৃথা। ফুঁ দিতে দিতে ফুসফুস ফেটে যাবে, তবু মৃত কঙ্কালে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব হবে না। 'জাতের নামে বজ্জাতির' দিন, বর্ণাশ্রমের নামে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্বের যুগ, কৌলীন্যের নামে বহু-বিবাহ ও পেশাদার জামাইগিরির কাল, অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন পোশাক পরিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে লাভ হবে না কিছু।